بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِهِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সীরাতুন্নবী সংখ্যা

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

সংখ্যা-33

বার্ষিক মূল্য
৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly
BADAR Qadian
Bangla

বর্ষ-5
সম্পাদক:
তাহের আহমদ
মুনির

Postal Reg. No. GDP/ 43 /2020 -2022   ১৩ ই আগস্ট, ২০২০ ❍ ১৩ যাহুর ১৩৯৯ হিজরী শামসী ❍ ২২ যুল হাজ্জ, ১৪৪১, হিজরী কামরী

হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালাম বলেন,

"সত্য প্রেমীদের জন্য খানা কাবা একটি বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হয়েছে, এবং খোদা তা'লা বলেছেন-"দেখ এটা আমার ঘর আর এই 'হাজরে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ প্রস্তর) আমার আস্তানার পাথর।" এই আদেশ এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ বাহ্যিকভাবে নিজের ভালবাসার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে। হজ্জ সম্পাদনকারীরা হজ্জের স্থানে বাহ্যিকভাবে এমন বেশভূষা নিয়ে এই ঘরের পরিক্রমা করে যেন তারা খোদার ভালবাসায় মত্ত হয়ে আছে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃঃ ১০০)

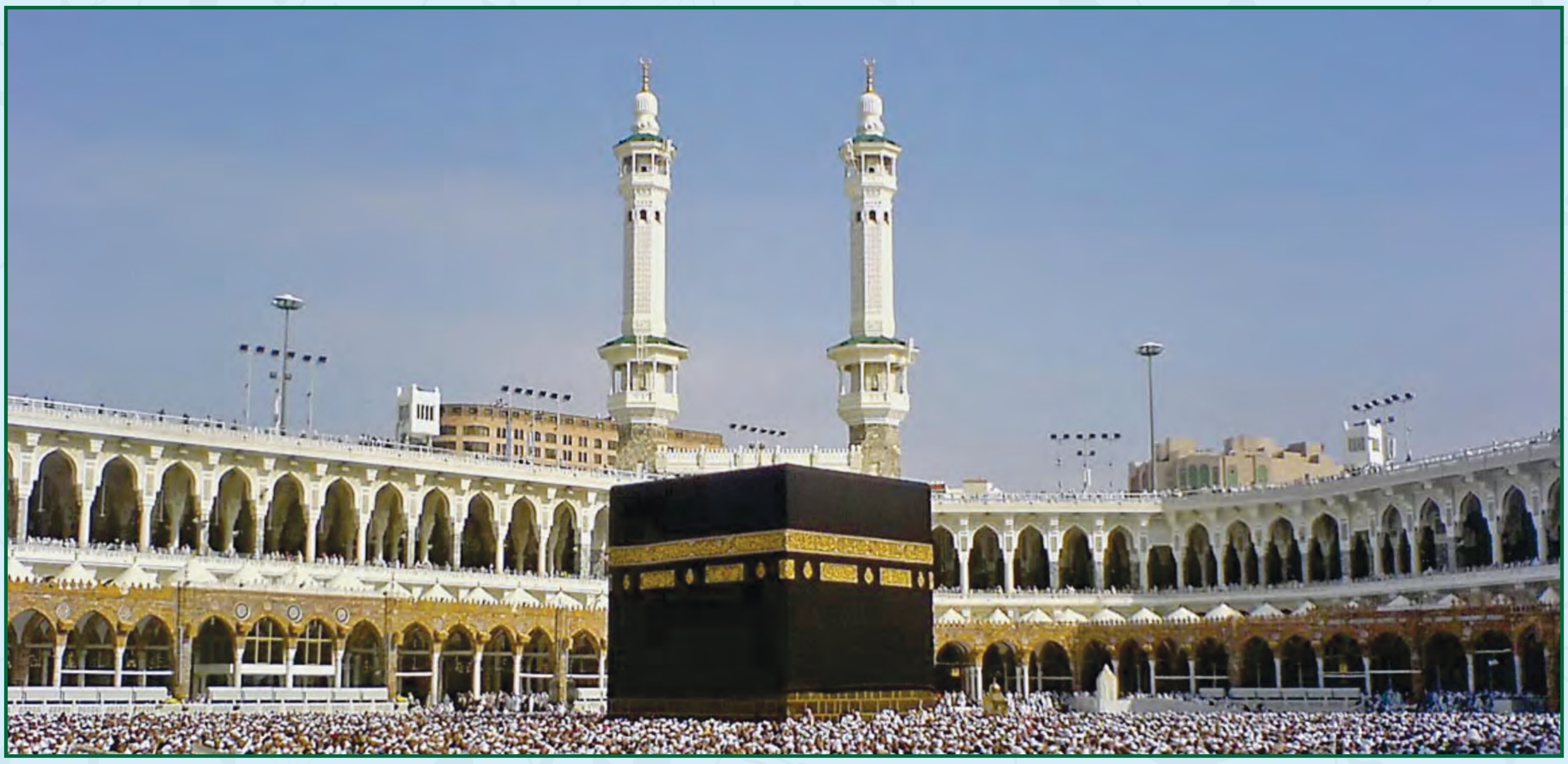

Printed

নাম তাঁর মহাম্মদ (সা.), প্রিয়তম আমার সে-ই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نُور سارا
সেই তো আমাদের নেতা যাঁর থেকে আসে সব আলো,

نام اس کا ہے محمد دلبر مرا یہی ہے
নাম তাঁর মহাম্মদ (সা.), প্রিয়তম আমার সে-ই।

سب پاک ہیں پیمبر اِک دوسرے سے بہتر
সকল নবীই পবিত্র, কেউ কারো থেকে এগিয়ে,

لیک از خدائے برتر خیرالوریٰ یہی ہے
কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে সৃষ্টির সেরা তিনিই।

پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں اِک قمر ہے
পূর্ববর্তীদের থেকে শ্রেষ্ঠতর– যেন পূর্ণিমার চাঁদ

اُس پر ہر اک نظر ہے بدرالدّجیٰ یہی ہے
তাঁর দিকেই সকলের দৃষ্টি, তিনিই আঁধার রাতের চাঁদ।

وہ یارِ لامکانی وہ دلبرِ نہانی
সেই শাশ্বত বন্ধু, সেই গোপন প্রিয়তম-

دیکھا ہے ہم نے اُس سے بس رہنما یہی ہے
আমরা দেখেছি যাঁকে তাঁরই মাধ্যমে; পথপ্রদর্শক তিনিই।

وہ آج شاہِ دیں ہے وہ تاجِ مرسلیں ہے
সেই তো আজ ধর্মের সম্রাট, রসূলগণের শিরোমণি

وہ طیّب و امیں ہے اُس کی ثنا یہی ہے
সে পবিত্র এবং সে বিশ্বস্ত, তাঁর প্রশংসা তো এ-ই।

اُس نُور پر فدا ہوں اُس کا ہی مَیں ہوا ہوں
সেই আলোর তরে আমি উৎসর্গিত, আমি তো হয়েছি তাঁরই,

وہ ہے مَیں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے
সেই তো সব, আমি কী বস্তু! চূড়ান্ত রায় এটিই।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
কুরআন ও হাদীসের আলোকে মহানবী (সা.)এর মর্যাদা	২
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদা	৩
জলসা সালানা (২০১৯) জার্মানীতে হুযুর আনোয়ারের সমাপনী ভাষণ	৪
শ্রেষ্ঠ রসূল হিসেবে আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদা	৮
মহানবী (সা.)-এর প্রাথমিক জীবন	১৩

সম্পাদকীয়

সাহাবাগণের প্রতি আঁ হযরত (সা.) এর সদয় আচরণ

সাহাবাগণের নিকট আঁ হযরত (সা.) নিজেদের প্রাণ এবং মাতাপিতার থেকেও অধিক প্রিয় ছিলেন, সর্বক্ষণ তাঁর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের থেকে প্রিয়তর বস্তু তাদের কাছে দ্বিতীয়টি ছিল না। ফলে আঁ হযরত (সা.)ও তাঁর সাহাবাগণকে যারপরনায় ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন আর তাদের প্রতি সহানুভুতি পোষণ করতেন। তিনি সর্বতোভাবে তাদের মনোতুষ্টি করতেন, আর্থিক সাহায্য করতেন। যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হত, তবে তিনি তার ঋণ শোধ করে দিতেন। সাহাবাদের প্রতি তাঁর ত্যাগময় উদার সর্বথা-আনত আচরণ ও সহানুভূতির কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আঁ হযরত (সা.)-এর এক নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন হযরত জাবের (রা.)। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম। হযরত জাবেরের পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। এই যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)কে তাঁর সত্তর জন পরম নিষ্ঠাবান সাহাবাকে হারানোর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, যাদের মধ্যে তাঁর চাচা হযরত হামযাও (রা.) ছিলেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ স্বয়ং বর্ণনা করেছেন,"একদিন রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন,'জাবের, তোমাকে আজ আমি এমন চিন্তিত ও বিষন্ন কেন দেখছি?' আমি উত্তর দিলাম, 'হুযুর আমার পিতা শহীদ হয়েছেন, আর তাঁর অনেক ঋণ এবং সন্তান-সন্ততি রেখে গেছেন।' হুযুর (সা.) বললেন, 'আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দান করব না যে কিভাবে আল্লাহর নিকট তোমার পিতার মনোস্তষ্টি হয়েছে। আমি নিবেদন করলাম, হুযুর অবশ্যই শোনান। যা শুনে তিনি (সা.) বললেন,আল্লাহ্ তা'লা যখন কারো সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন পর্দার অন্তরালে থেকে বলেছেন। কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করার পর তার সামনে এসে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং বলেছেন, "হে আমার বান্দা! যা খুশি চাও, আমি তোমাকে দিব।" তোমার পিতা উত্তরে বললেন, "হে আমার প্রভু, আমি চাই আমাকে পুণরায় জীবিত করে পৃথিবীতে পাঠানো হোক যাতে তোমার কারণে পুণরায় নিহত হই।" উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বললেন, "এটা হতে পারে না। কেননা আমি এই নিয়ম বলবৎ করে রেখেছি যে মৃত্যুর পর কাউকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবো না।"

(তিরমিযী, আবওয়াবুত তফসীর, সূরা আলে ইমরান, হাদীস-৩২০)

হযর জাবের (রা.)কে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, 'অমুক ইহুদীর কাছ থেকে নেওয়া ঋণ আমার শাহাদতের পর বাগানের ফল বিক্রি করে পরিশোধ করে দিও। হযরত জাবের (রা.) পিতার শেষ আদেশ অনুসারে ইহুদীর ঋণ পরিশোধ করেন।

(খুতবা জুমা, ৩০ শে মার্চ, ২০১৮)

বাগান এবং ক্ষেতের ফসলের বিনিময়ে ঋণ নেওয়া সে যুগের প্রথা ছিল। হযরত জাবেরও (রা.) নিজের খরচ নির্বাহের জন্য ঋণ নিতেন। এমনই এক ঋণের উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায় যা তিনি এক ইহুদীর কাছে নিয়েছিলেন। হযরত জাবের ইহুদীকে বললেন, এবছর ফসল উৎপাদন কম, তাই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দাও। কিছুটা এখন নাও, বাকিটুকু পরের বছর নিও। কিন্তু সেই ইহুদী কোন প্রকার ছাড় দিতে প্রস্তুত হল না। আঁ হযরত (সা.) এ সম্পর্কে জানতে পেরে সেই ইহুদীর কাছে হযরত জাবেরের সুপারিশ নিয়ে যান, কিন্তু তবু সে সম্মত হল না। অতঃপর আঁ হযরত (সা.) কিভাবে তাঁর সেই সাহাবীকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর জন্য দোয়া কছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে কৃপা বর্ষণ করেছেন, সে সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ স্বয়ং বর্ণনা করেন, "মদিনায় এক ইহুদী বাস করত যে আমাকে আমার খেজুরের বাগানের নতুন ফসল ওঠা পর্যন্ত ঋণ দিত। রুমা' নামক একটি কূপের রাস্তায় আমার জমিটি ছিল। একবার বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু ফল কম উৎপাদন হল, উপরন্তু ভালভাবে পরিপক্কও হল না। ফসল ওঠার সময় সেই ইহুদী যথারীতি নিজের ঋণ আদায়ে এসে পড়ল, অথচ সেবছর ঘরে তখনও কোন ফল তুলি নি। তাই আমি তার কাছে আরও একবছরের সময় চাইলাম, কিন্তু সে অস্বীকার করল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হয়তো পুরো বাগানটি তার দখলে চলে আসবে। আঁ হযরত (সা.) এ বিষয়ে জানতে পেরে সাহাবাগণকে বললেন, 'চল, আমরা ইহুদীর কাছে গিয়ে জাবেরের জন্য সময় চাই।" রসুলুল্লাহ্ (সা.) কয়েকজন সাহাবার সঙ্গে আমার বাগানে এসে ইহুদীর সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু সেই ইহুদী বলল, 'হে আবুল কাসিম! আমি তাকে ছাড় দিব না।' ইহুদীর এমন আচরণ দেখে তিনি খেজুরের গাছগুলি একবার প্রদক্ষিণ করে ইহুদীর সঙ্গে পুনরায় কথা বলেন। কিন্তু সে অসম্মতি জানায়। এরই মাঝে আমি বাগানের কিছু ফল পেড়ে এনে আঁ হযরত (সা.)কে দিই, যা তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, 'জাবের, তোমাদের বাগানে যে কুঁড়ে ঘর থাকে, বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা থাকে, সেটি কোথায়?' আমি দেখিয়ে দিলে তিনি, বললেন, 'আমার জন্য সেখানে একটি মাদুর পেতে দাও, একটু বিশ্রাম নিব।' আমি আজ্ঞা পালন করলাম, আর তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমি পুণরায় একমুঠো খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি সেগুলির কয়েকটি খাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন এবং ইহুদীর সঙ্গে আবারও কথা বললেন, কিন্তু সে রাজি হল না। তিনি পুনরায় বাগান প্রদক্ষিণ করে আমাকে বললেন, 'জাবের, খেজুর পাড়তে আরম্ভ কর আর এই ইহুদীর ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমি ফল পাড়তে আরম্ভ করলাম। এই সময় তিনি বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি ফল সংগ্রহ করার পর ইহুদীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিলাম, এরপরও কিছু খেজুর অবশিষ্ট থাকল। আমি হুযুর (সা.)-এর নিকট এই সুসংবাদ জানালে তিনি বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আল্লাহর রসূল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আতইমা,হাদীস-৫৪৪৩, খুতবা জুমা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস, প্রদত্ত, ৩০ শে মার্চ, ২০১৮ থেকে সংগৃহীত)

হযরত জাবের (রা.)এর প্রতি আঁ হযরত (সা.)-এর স্নেহ, ভালবাসা এবং সহানুভূতির আরও একটি ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, 'একটি যুদ্ধে আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর সঙ্গী ছিলাম। হুযুর (সা.) আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার উটের কি হয়েছে, সে হাঁটছে না কেন?" আমি বললাম, 'হুযুর! এর চলার শক্তি নেই'। হুযুর উটটিকে হাকাতে শুরু করেন এবং দোয়াও করতে থাকেন। অবশেষে উটটি দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তোমরা উটটি কেমন আছে?" আমি বললাম, হুযুরের দোয়া এবং বরকতের কারণে এখন দ্রুত হাঁটছে। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি এটিকে বিক্রি করবে?" হযরত জাবের বলেন যে কাছে পানি বহনের জন্য তার কাছে এটি ছাড়া অন্য কোন উট ছিল না, কিন্তু সংকোচের কারণে তিনি বলেন, 'বিক্রি করব।' হুযুর (সা.) বলেন, 'তবে আমার কাছে বিক্রি কর।' আমি হুযুরের কাছে এই শর্তে উটটি বিক্রি করলাম যে মদিনা পর্যন্ত এতে চড়ে যাব। যাত্রাকালে আমি হুযুর (সা.)কে আমি

এরপর ১৯-এর পাতায়.....

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মহানবী (সা.)এর মর্যাদা

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ ۚ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

নিশ্চয় যাহারা তোমার বয়'আত করে বস্তুতঃপক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌র বয়'আত করে। আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর আছে।

(সূরা আল ফাতাহ:১১)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (انفال:18)

এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং যেন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে মোমেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(সুরা আনফাল, আয়াত: ১৮)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۖ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে কেহ এই রসুলের আনুগত্য করে বস্তত: সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেইক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

(সুরা নিসা, আয়াত: ৮১)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى

অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হইয়া গেল অথবা উহা হইতেও নিকটতর হইয়া গেল।

(সূরা নজম, আয়াত: ১০)

يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক নাযেল করিয়াছি।

(সুরা নিসা, আয়াত: ১৭৫)

يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتٰبٌ مُبِينٌ

হে আহলে কিতাব! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমরা কিতাবের মধ্য হইতে যাহা কিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহুলাংশে তোমাদের নিকটে পরিস্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহুলাংশে মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

(সুরা মায়েদা, আয়াত: ১৬)

نُورٌ عَلٰى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النور:36)

নূরের উপর নূর! আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্‌ মানব-মণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلِفُ الْبَعِيرَ وَيُقِيمُ الْبَيْتَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَحْلِبُ الشَّاةَ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ وَيَطْحَنُ مَعَهُ إِذَا أَعْيَا وَكَانَ لَا يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ يُصَافِحُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَيُسَلِّمُ مُبْتَدِيًا وَلَا يَحْتَقِرُ مَا دُعِيَ إِلَيْهِ وَلَوْ إِلَى حَشَفِ التَّمْرِ وَكَانَ هَيِّنَ الْمُؤْنَةِ لَيِّنَ الْخُلُقِ كَرِيمَ الطَّبِيعَةِ جَمِيلَ الْمُعَاشَرَةِ طَلِقَ الْوَجْهِ بَسَّامًا مِنْ غَيْرِ ضَحِكٍ مَحْزُونًا مِنْ غَيْرِ عُبُوسَةٍ مُتَوَاضِعًا مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ جَوَّادًا مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ رَقِيقَ الْقَلْبِ رَحِيمًا بِكُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يَتَجَشَّأْ قَطُّ مِنْ شِبَعٍ وَلَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى طَمَعٍ۔

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) (এর জীবন অত্যন্ত সহজ সরল ছিল, তিনি কোন কাজকে বোঝা মনে করতেন না) নিজের উটকে খেতে দিতেন, সংসারের কাজকর্ম করতেন, নিজের জুতো সারাতেন, কাপড় ভাঁজ করে রাখতেন, ছাগলের দুধ দুইতেন, সেবককে নিজের কাছে বসিয়ে খেতে দিতেন, আটা পেষার সময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে সাহায্য করতেন। বাজার থেকে সংসারের জিনিসপত্র বয়ে আনতে সংকোচ করতেন না। তিনি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে করমর্দন করতেন। প্রথমে সালাম করতেন, যদি কেউ সামান্য খেজুরের নেমন্তন্নও করতেন তবু তিনি সেটাকে অবজ্ঞা করতেন না, গ্রহণ করতেন। তিনি অত্যন্ত সহানুভুতিশীল, কোমল স্বভাবের এবং দয়ালু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনযাপন অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল ছিল। মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করতেন। তাঁর চেহারার হাসি কখনও ম্লান হত না। তিনি কখনও অট্টহাসি দিয়ে হাসতেন না। খোদা ভীতির কারণে চিন্তিত থাকতেন, তথাপি চেহারা থাকত নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। তিনি শান্ত স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু তাতে কোন দুর্বলতা ও হীনমন্যতার লেশমাত্র ছিল না। অত্যন্ত দানশীল ছিলেন, কিন্তু সব সময় অহেতুক খরচ এড়িয়ে চলতেন। কোমল হৃদয়, দয়ালু ও স্নেহশীল ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে অনুগ্রহপূর্বক আচরণ করতেন। এতটা পেট ভরে আহার করতেন না যাতে সব সময় ঢেকুর ওঠে। কখনও লালসার বশে হাত পাতেন নি, বরং ধৈর্যবান, কৃতজ্ঞ থেকেছেন, অল্পতে তুষ্ট থেকেছেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ:২৯, হাদীস-৪৩)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلٰوتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالٰى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ ۔ أَوْ لِغَيْرِهِ ۔ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ ۔ (ابوداؤد کتاب الصلوۃ باب الدعا)

হযরত ফাযালা বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শুনলেন। না তো সে নামাযে আল্লাহ্‌ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করল, না আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করল। তা দেখে আঁ হযরত (সা.) বললেন, সে ত্বরাপরয়ণতার পরিচয় দিয়েছে, সঠিক পদ্ধতিতে দোয়া করে নি। তিনি (সা.) সেই ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দোয়া করে, তখন সে যেন সর্বপ্রথম নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, এবং এর পর নবী করীম (সা.)-এর উপর দরুদ প্রেরণ করে। এরপর দোয়া কর যা মনের ইচ্ছে আছে।

** * ❖ ***** ❖ ***** ❖ * ***

আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি দিলে এবিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আঁ হযরত (সা.) ছিলেন কথা ও কাজে অভিন্ন, স্বচ্ছ-হৃদয়, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। সৃষ্টির ওপর নির্ভর করা ও তাদের কাছে আশা-ভরসা রাখা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিমুখ, কেবল খোদার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি। যিনি খোদার ইছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত ছিলেন, আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী-কী বিপদ আমার ওপর আপতিত হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দুখ ও বেদনা আমাকে সইতে হবে। বরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলী শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন আর খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়াজ ও নসীহতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন। কোন ভয়প্রদর্শনকারীকে এতটুকু গুরুত্ব দেন নি। আমরা সত্য-সত্যই বলছি, নবীকুলের ঘটনাবলীতে ভয়াবহ বিপদের মুখে খোদার উপর এভাবে ভরসা করে প্রকাশ্যে শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শত্রু থাকা সত্ত্বেও এরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না। সুতরাং কিছুটা হলেও সততার সাথে ভাবা উচিত যে, এসকল পরিস্থিতি কত পরিস্কারভাবে মহানবীর অভ্যন্তরীণ সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়া বিবেকবানরা এসব পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি আরও চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে, যে যুগে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছেন তা সত্যিকার অর্থে এমন এক যুগ ছিল, যখন বিরাজমান পরিস্থিতি এক বড় ও মহান ঐশী সংস্কারক ও স্বর্গীয় পথপ্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর যে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বাস্তবে তা ছিল সত্য ও অত্যাবশ্যকীয় এবং সেকল বিষয়ের সমাহার যার মাধ্যমে যুগের সকল চাহিদা পূরণ হতো। আর এ শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য ও সততার প্রতি টেনে এনেছে আর লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ছাপ প্রোথিত করেছে। অধিকন্তু; নবুয়্যতের যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে থাকে অর্থাৎ মুক্তিলাভের নীতি- একে এমন পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়েছে যে, অন্য কোন নবীর সেই পরাকাষ্ঠা কোন যুগে লাভ হয় নি। এ সকল ঘটনার উপর দৃষ্টিপাতে অবলীলায় হৃদয় এ সাক্ষ্য দেবে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে সত্য পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যে ব্যক্তি বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত অস্বীকার করে তার ব্যধি দুরারোগ্য হয়ে থাকে আর এমন মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে বসে। নতুবা সত্যের সেসব লক্ষণ যা মহানবীর সত্তায় পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত ছিল অন্য কোন নবীর মাঝে কেউ এর একটি তো প্রমাণ করে দেখাক যেন আমরাও তা অবগত হতে পারি। "

(বারাহীনে আহমদীয়াত, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাবী সূর্যের ন্যায় আলো বিচ্ছুরণ করছে, এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরন্তন জীবনের এ এক বড় শক্তিশালী প্রমাণ যে, সেই প্রশংসিত পুরুষের কৃপারাশিও চিরন্তনরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি, যে ব্যক্তি এই যামানাতেও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, সন্দেহ নেই যে, তাকে কবর থেকে উঠানো হয়, এবং তাকে এক আধ্যাত্মিক জীবন দান করা হয়। এ কোন কল্পনা নয়, বরং তা বাস্তবেই প্রকাশিত হয় তার সাধুতার কার্যকারিতা দ্বারা। এবং আসমানী সাহায ও কল্যাণরাজি এবং রুহুল কুদ্দুস বা পবিত্র আত্মার অসামান্য সমর্থন সর্বদা তার সঙ্গী হয়। সারা পৃথিবীর মানুষের মধে সে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। এমনকি, খোদা তা'লা তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দেন, এবং তার উপরে বিশিষ্ট রহস্যাবলী প্রকাশিত করতে থাকেন, এবং আপন তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার তার কাছে উন্মোচিত করে দেন। এবং আপন ভালবাসা ও অনুগ্রহের লক্ষণসমূহ তার মধ্যে বিকশিত করতে থাকেন। এবং আপনার সাহায্যবলী তার উপরে বর্ষণ করতে থাকেন। এবং আপন কল্যাণরাশি তার মধ্যে সংস্থাপিত করেন। এবং তাকে আপন রবুবিয়াতের (প্রভু-প্রতিপালকত্বের- আয়নায় রূপান্তরিত করেন। তার জবান থেকে হেকমত ও প্রজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হতে থাকে। তার হৃদয় থেকে সব সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রস্রবন উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তার নিকটে গোপন রহস্যাবলীর ভেদ উন্মোচিত হয়। এবং খোদা তা'লা তার উপরে এক আজিমুশশান তাজাল্লি এক অতি মহিমামণ্ডিত জ্যোতির প্রকাশ সংঘটিত করেন। এবং তার সন্নিকটবর্তী হয়ে যান। তখন সে তার দোয়া বা প্রার্থনার জবাব প্রাপ্তিতে, আপনার কবুলিয়্যত বা স্বীকৃতিতে, নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাতের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করণে, এবং গোপন রহস্যাবলীর ভেদ উন্মোচনে, এবং তার উপরে আশিস ও কল্যাণরাশির বর্ষণে সবার উপরে অবতীর্ণ হয় এবং সকলের উপর জয়যুক্ত হয়।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২১)

যেহেতু আঁ হযরত (সা.) বাতেনী পবিত্রতায়, হৃদয়ের প্রসারতায়, নিষ্পাপ হওয়ায়, নম্রতায়, সততায়, বিশ্বস্ততায়, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতায়, কৃতজ্ঞতায় এবং ভালবাসায়, প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সকল নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উন্নত এবং পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ ছিলেন; সেহেতু আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু তাঁকে (সা.) বিশেষ উৎকর্ষতার বা খাস কামালাতের আতর দিয়ে সবার চাইতে বেশি করে অভিষিক্ত করেছেন। এবং সেই বক্ষ ও হৃদয়, যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বক্ষ ও হৃদয় থেকে অধিক প্রসারিত এবং পবিত্র এবং নিষ্পাপ এবং আলোকিত এবং প্রেমিক ছিল, তাকে এরূপ উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হলো যে, তার উপরে এমন ওহী নাযিল বা ঐশী কালাম অবতীর্ণ হল যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওহী থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং পূর্ণ এবং উন্নত এবং উত্তম। এবং সেই কারণেই তা ঐশী গুণাবলী প্রদর্শনের নিমিত্তে এক স্বচ্ছ-সুনির্মল এবং প্রশস্ত এবং বৃহদাকার আয়না হয়ে গেল। সুতরাং, এটাই সেই কারণ, যে জন্য কোরআন শরীফে যে কামালাত বা পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান তার সামনে পূর্ববর্তী কেতাবগুলির দীপ্তি নিভু নিভু হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১, পাদটীকা)

আমাদের নবী (সা.) সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এক মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি অবলুপ্ত সত্যকে পুনরায় ধরাতে নিয়ে এসেছেন। এ গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে অন্য কোন নবীই শরীক নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সারা পৃথিবীকে এক অন্ধকারে পেয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাব সেই অন্ধকারে আলোতে বদলে গেছে। যে জাতিতে তিনি এসেছেন ততক্ষণ তিনি মৃত্যু বরণ করেন নি যতক্ষণ সেই জাতি পৌত্তলিকতার আবরণ খুলে একত্ববাদের আবরণ পরে নিয়েছে। শুধু এটাই নয়, বরং তাঁরা ঈমানের উন্নত মার্গে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁদের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানের এমন কার্যাবলী সাধিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এ সাফল্য এবং এ মার্গের সফলতা আঁ হযরত (সা.) ছাড়া অন্য কোন নবীর ভাগ্যে জোটে নি। আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতার পক্ষেই এটিই একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক সময়ে প্রেরিত ও আবির্ভুত হয়েছেন, যখন যুগ চরম পর্যায়ের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর স্বভাবতঃই এক মহান সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অতপর তিনি এমন একটি স ময়ে ইন্তেকাল করেছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে তওহীদ (একত্ববাদ) ও সঠিক পথকে অবলম্বন করেছিল। আর প্রকৃত পক্ষে এই কামেল ও

এরপর ১৬ পাতায়.....

পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আজ ইসলামি শিক্ষারই প্রয়োজন

পৃথিবীকে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে প্রত্যেক আহমদীর ভূমিকা থাকা দরকার।

নবী করীম (সা.) -এর পবিত্র জীবনাদর্শ দ্বারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিবরণ

জামাত আহমদীয়াকে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী অনুসরণণের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করার উপদেশ

আঁ হযরত (সা.) এর অতুলনীয় উন্নত আচরণ, ইবাদতে ইলাহি, বা-জামাত নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠতা, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, বিনয়, কৃতজ্ঞতাস্বীকার, আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা, মধ্যমপন্থা ও তাঁর সৌন্দর্যের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন সঠিক অর্থে এই পরিপূর্ণ নবীর উম্মত হই এবং সেই সৌন্দর্য ও দীপ্তিময় চেহারা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে পৃথিবী অন্ধকার দূরীভূত করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন ।

৭ই জুলাই, ২০১৯,জলসা সালনা জার্মানী উপলক্ষ্যে, কালসারওয়ে থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ।

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۔(الاحزاب-22)

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

(সূরা আহযাব, আয়াত: ২২)

অমুসলিম বিশ্বে, পশ্চিমি বিশ্বে বা উন্নত দেশগুলিতে মুসলমানদের সম্পর্কে যে সংরক্ষণবাদী নীতি পাওয়া যায়, সেগুলির জন্য অনেকাংশে দায়ী মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের পরিচিতির অভাব। উপরন্ত ইসলামের নামে মুষ্টিমেয় মুসলমানের উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং আইনকে তারা নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় এদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলাম সন্ত্রাসেরই ধর্ম। আজ ইসলামের শিক্ষার প্রসার এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাবকে দূরীভূত করার কাজ আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর জামাতের সোপর্দ করেছেন। তাই প্রত্যেক আহমদীকে এর জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। দুনিয়ার মানুষ সংবাদ মাধ্যমের খবর শুনে মনে করে বসে যে এরা যা কিছু বলছে অর্থাৎ সংবাদ যা কিছু বলছে তা একশ শতাংশ সত্য। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই ধর্মের বিষয়ে আগ্রহ রাখে না। তাই এমতাবস্থায় কঠোর পরিশ্রম এবং নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। একজন সাধারণ অমুসলিম একথাই মনে করে যে মুসলমানদের এই কর্মধারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর কর্মপন্থার কারণে মুসলমানরা এই পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

কাজেই যেমনটি আমি বলেছি, এই প্রভাবকে দূর করতে এবং পৃথিবীকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে প্রত্যেক আহমদীকে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা পৃথিবীকে বলা দরকার যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি এবং আঁ হযরত (সা.)-এর কর্মপন্থা কি? আল্লাহ্ তা'লা যে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, এর উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন যথাযথভাবে তাঁর ইবাদতও করে আর বান্দার অধিকারও প্রদান করে। যারা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী হবে, নিশ্চয় তারা বান্দাদের অধিকারও প্রদানকারী হবে। এই অধিকার প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে আমাদের প্রিয় নবী ও মান্যবর পূর্ণমানবের আদর্শ রেখেছেন এবং এই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে এই পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত আমাদের পথপ্রদর্শক; যারা এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি কর, তারা এটিকে অবলম্বন কর। এই আদর্শের প্রতিটি আঙ্গিকের উপর অনুশীলন করার চেষ্টা কর, অতঃপর পৃথিবীবাসীকেও বল যে এটি ইসলাম। ইসলাম সেটি নয় যা মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামের নামে তুলে ধরে এবং যেটিকে পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যম আরও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করছে।

আঁ হযরত (সা.) আমাদের সামনে নিজের আদর্শ দ্বারা কিরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন সেগুলির কয়েকটি আঙ্গিক এখন আমি আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করব যাতে আমরা নিজেদেরকে ঐ সব দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখি এবং উচ্চ নৈতিক আদর্শের আলোকে তিনি (সা.) আমাদেরকে যে উপদেশ দান করেছেন সেগুলিকে আমরা নিজেদের বাস্তব জীবনের নিরিখে পর্যালোচনা করে দেখি; ইসলামী শিক্ষার আলোকে তিনি (সা.) আমাদেরকে যে নির্দেশাবলী দান করেছেন সেগুলির পর্যালোচনা করি, যে দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন সেগুলি অনুসারে আমরা নিজেদেরকে দেখি। আমরা যখন সেই (শিক্ষা) অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করব, তখনই পৃথিবীকে বলতে পারব যে বাস্তবে ইসলাম কি জিনিস আর পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আজ যে জিনিসটির সব থেকে বেশি প্রয়োজন তা হল ইসলামী শিক্ষা। আল্লাহ্ তা'লা ইবাদকে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কেবল একথাই বলেন নি যে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার ইবাদত করা। তাই প্রত্যেক মোমেনের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত আর তারা যেন এই উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করে। বরং তিনি নিজের ইবাদতের মান প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যেগুলির গ্রহণীয়তার প্রমাণও আল্লাহ্

তা'লা দান করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন- الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ

যিনি তেমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামাযে) দণ্ডায়মান হও, এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সেজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা কর। (শোয়ারা: আয়াত-২১৯-২২০)

তাই এটি ছিল তাঁর সিজদা ও ইবাদতের অবস্থা। তাঁর ব্যকুলতা এমন ছিল যে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় স্নেহদৃষ্টিতে সিক্ত করে বিশেষভাবে সেই ইবাদত এবং ব্যকুলতার উল্লেখ করছেন। এই ব্যকুলতা কার জন্য জন্য এবং কিসের কারণে ছিল? এই ব্যকুলতা এবং দোয়া ছিল নিজ জাতির জন্য, আর্ত মানবতার জন্য; সেই সমস্ত মানুষকে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝানো জন্য ছিল যারা আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে রয়েছে। কেননা এই ব্যবধান আল্লাহ্ তা'লান বিরাগভাজনের কারণ হতে পারে। তাই তাঁর ব্যকুলতা দেখে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এও বলেছেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে, এ কারণে যে তারা কেন ঈমান আনছে না? (শোআরা: ৪) তোমার হৃদয় এ নিয়ে অস্থির যে কাফেররা কেন হিদায়াত লাভ করে না, কেন খোদা তা'লার উপর ঈমান এনে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুসজ্জিত করে না। তাই যেখানে এর দ্বারা আঁ হযরত (সা.) -এর ইবাদতের মান সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি জানা যায় মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁর পবিত্র হৃদয়ের ব্যগ্রতা, প্রকাশ পায় তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের চিত্রও। কাজেই যার মনে মানবতার জন্য এমন বেদনা থাকে সে কি কখনও অত্যাচারী হতে পারে? নিশ্চয় না। তিনি খোদা তা'লার ইবাদত, তাঁর সৃষ্টির সেবা এবং তাদের জন্য আকুল হয়ে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছেন। সাহাবারাও অনেক সময় তাঁর ইবাদতের অবস্থা দেখার সুযোগ পেয়ে যেতেন। একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, "আমি রসুল করীম (সা.) কে নামায পড়তে দেখেছি। সেই সময় ক্রন্দনের কারণে তাঁর বক্ষদেশ থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেমনটি জাঁতাকল চললে হয়ে থাকে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

এই দোয়া কি ছিল? এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকার দোয়া। এটি ছিল স্বজাতির জন্য দোয়া, মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার দোয়া। আঁ হযরত (সা.)-এর এই দোয়াই সেই সময়ও এক বিপ্লব সাধন করেছিল আর শতাব্দীর পর শতাব্দী মৃতরা জীবিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর এই দোয়াই গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে এই যুগে তাঁর একনিষ্ঠ দাসকে এই বিপন্ন যুগে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। তাই আজ আমরা যারা আহমদী তাদের দায়িত্ব হল নিজেদের ইবাদতের মানকে সমুন্নত করা এবং এই আদর্শ অনুসরণের চেষ্টার মাধ্যমে খোদা তা'লার নিকট এমন সেজদা করা যা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই পূর্ণ করবে না, বরং তা হবে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন রাখার উদ্দেশ্যে, নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হিসেবে তৈরী করার উদ্দেশ্যে মানবতাকে নিজ স্রষ্টা খোদার নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

ফরয এবং বা জামাত নামাযের জন্য আঁ হযরত (সা.) কিরূপ নিয়মানুবর্তিতা করতেন, বা কিছু ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে কিরূপ পরিশ্রম করতেন তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ওহদের যুদ্ধের সন্ধ্যায় আঁ হযরত (সা.)-এর নিজেরই লৌহ শলাকা তাঁর ডান গালে ভেঙ্গে পড়লে অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তিনি আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। এছাড়াও সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ক্ষত এর থেকে অনেক বেশি পীড়াদায়ক ছিল। সেদিনও তিনি আযানের কণ্ঠে ঠিক সেভাবেই ফজরের নামাযে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেভাবে সাধারণ দিনগুলিতে নামাযে আসতেন।

(উসওয়ায়ে ইনসানে কামিল, পৃ: ৮৪)

তাঁর এই কর্মপন্থাই সাহাবাদের মধ্যেও ইবাদতের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। তাই আজ আমাদের প্রত্যেককে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, যখন আমরা এই নারাধ্বনি উচ্চকিত করি যে এখন মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থান হবে, (তখন আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে) আমরা যারা ইসলামের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করব তাদের ইবাদত বা বা-জামাত ইবাদতের মান কি সেই মানের ধারেকাছেও যেতে পারে? সামান্য কষ্ট হলেই মসজিদে না যাওয়ার অজুহাত তৈরী থাকে। সকালে উঠে দু'বার হাঁচি হলে বলে দিই আজ শরীর অসুস্থ, বাড়িতেই নামায পড়ে নাও। চেষ্টা করলে তবেই না অলসতা দূর হয়। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত, আমরাও যেন নিজেদের ইবাদতের মান সমুন্নত করার চেষ্টা করি। সেই দোয়াই এযুগে পৃথিবীতে বিপ্লব সাধনের মাধ্যম হবে। আমাদের দোয়া-শূন্য তবলীগ ফলপ্রসূ হবে না। দোয়া ছাড়া আমাদের জ্ঞানগত প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই, পৃথিবীকে যদি প্রকৃত ইসলাম শেখাতে হয় তবে সর্ব প্রথম আমাদেরকে খোদা তা'লার সঙ্গে সেই মানের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত যা আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণ তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে স্থাপন করেছিলেন এবং যার চিত্র অঙ্কন করেছেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঠিক এই ভাষায়- 'মোদ্দা কথা হল কুরআন মজীদ তাঁদের প্রাথমিক যুগের চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছে- "يَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ অর্থাৎ তারা এমনভাবে খাদ্যগ্রহণ করত যেভাবে জীবজন্তু খাদ্যগ্রহণ করে।" এটি ছিল তাদের কুফর-এর অবস্থা। অতঃপর যখন আঁ হযরত (সা.) -এ পবিত্র ও পুণ্যময় প্রভাব তাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করল তখন তাদের অবস্থা হল- يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا (ফুরকান: ৬৫) অর্থাৎ তারা নিজ প্রভুপ্রতিপালকের সমীপে সিজদারত অবস্থায় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।" (মালফুযাত: ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

কাজেই এই অবস্থা আমাদের নিজেদের মধ্যেও তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত।

এমন যেন না হয় যে ফজরের নামাযে ওঠার সময়েও অলসতা দেখাব। হযরত আলি (রা.) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন আর তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল, তখন তাঁর শেষ উপদেশ এবং বার্তা ছিল, নামায এবং ক্রীতদাসদের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান থেকো।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস-২৬৯৮)

এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার এবং সৃষ্টিজগতের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর ব্যকুলতা, এবং সেই শেষ উপদেশ যা প্রত্যেক মোমেনকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আর এটিই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার উদ্দেশ্য। অলসতা এবং জাগতিক ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য না ভুলে সবসময় আমাদেরকে সেই উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, AMJ Sian, (Birbhum)

এরপর আসে খোদা তা'লার উপর ভরসা রাখার বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চমানের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হল - وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا- (নিসা: ৮২) অর্থাৎ এবং আল্লাহ তা'লার উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। বরং মৃত্যুশয্যাতেও তিনি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে পাছে তিনি খোদার দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হন যখন আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা না করার বিন্দুমাত্র সংশয়ও সৃষ্টি হয়। তাই হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "আমার কাছে তিনি সাত বা আট দিনার সঞ্চিত রেখেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি বললেন, আয়েশা! তোমার কাছে যে সোনাটুকু রাখা ছিল সেটির কি হল? হযরত আয়েশা বলেন, "আমি বললাম, সেটি আমার কাছে রয়েছে। তিনি (সা.) বললেন, আয়েশা! সেটি সদকা করে দাও। এরপর আয়েশা কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি (সা.) যখন পুনরায় সম্বিত ফিরে পেলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সদকাটুকু করে দিয়েছ? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দিলেন, এখনও করি নি। তিনি (সা.) তাঁকে বললেন এখনই যাও, আমার কাছে সেটি নিয়ে এস। তিনি সেই দিনার চেয়ে নিজের হাতে নিয়ে গণনা করলেন এবং বললেন, মহম্মদ (সা.)-এর নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি কি ভরসা থাকল, যদি খোদার সঙ্গে সাক্ষাত এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এই দিনারগুলি তার কাছে অবশিষ্ট থেকে যায়? এরপর হুযুর (সা.) সেই দিনারগুলি সদকা করে দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

কিন্তু তিনি অন্যদেরকে উপদেশ করেছেন যে আমি তো আল্লাহ তা'লার নবী এবং প্রিয়ভাজন, এটি (সদকার মান) আমার জন্য। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসাও কর, কিন্তু সন্তান-সন্ততিকে দারিদ্র ও পরীক্ষা থেকে রক্ষার জন্য তাদের জন্য যদি তোমাদের কাছে কোনও সম্পদ বা অর্থ থাকে তবে তা রেখে যাও। এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়্যত করার অনুমতি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস- ২৭৪২)

আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে কুরআন করীমে উত্তরাধিকার বন্টনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সঙ্গে তিনি এও বলে দিয়েছেন যে আদম সন্তানের হৃদয়ের প্রতিটি খাঁজে একটি উপত্যকা রয়েছে। (প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে একটি করে উপত্যকা রয়েছে।) যার হৃদয় এই সব উপত্যকার পিছনে লেগে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তার পরোয়া করেন না যে কোন উপত্যকা তার ধ্বংসের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা করে, তাকে আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত উপত্যকা থেকে রক্ষা করেন।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-৪১৬৬)

কাজেই ইসলাম জাগতিক কাজকর্ম করারও অনুমতি দেয়, কিন্তু দিনরাত শুধ সম্পত্তি তৈরী এবং জাগতিক কাজকর্মে ডুবে থাকতে নিষেধ করে। ইসলাম যে প্রাথমিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটি হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং তাঁর উপর আস্থা। যদি এটি থাকে তবে জাগতিক জটিলতা থেকেও মানুষ রক্ষা পায়। আঁ হযরত (সা.) তাঁর জাতিকে আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা করার উপদেশ দান করে বলেন- যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা রাখ যেভাবে তাঁর উপর ভরসা রাখা যায় তবে তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই এমনভাবে রিযক দান করবেন যেভাবে পাখিদেরকে তিনি রিযক দিয়ে থাকেন, যারা সকালে খালিপেটে বের হয়ে আর সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-৪১৬৪)

এবিষয়টি সবসময় আমাদেরকে এবিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত যে রিযক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং তা অর্জনের জন্য আমাদের নিজেদের ইবাদতসমূহ বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। কাজ অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু প্রকৃত আস্থা যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপরই থাকে, কাজের কারণে ইবাদতসমূহকে বিসর্জন না দেওয়া হয়। আঁ হযরত (সা.) -সম্পর্কে এক স্থানে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে,

"আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি দিলে এবিষটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আঁ হযরত (সা.) ছিলেন কথা ও কাজে অভিন্ন, স্বচ্ছ-হৃদয়, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। সৃষ্টির ওপর নির্ভর করা ও তাদের কাছে আশা-ভরসা রাখা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিমুখ, কেবল খোদার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি। যিনি খোদার ইছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত ছিলেন, আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী-কী বিপদ আমার ওপর আপতিত হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দুখ ও বেদনা আমাকে সইতে হবে। বরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলী শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন আর খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়াজ ও নসীহতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন। কোন ভয়প্রদর্শনকারীকে এতটুকু গুরুত্ব দেন নি। আমরা সত্য-সত্যই বলছি, নবীকুলের ঘটনাবলীতে ভয়াবহ বিপদের মুখে খোদার উপর এভাবে ভরসা করে প্রকাশ্যে শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শত্রু থাকা সত্ত্বেও এরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না।"

(বারাহীনে আহমদীয়াত, ২য় ভাগ, রুহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১-১১২)

এরপর রয়েছে উচ্চ নৈতিকতার একটি গুণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি। আঁ হযরত (সা.) এই গুণের উচ্চ মানের কোন আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন? আঁ হযরত (সা.) সব সময় এই সন্ধানে থাকতেন যে কিভাবে খোদা তা'লার সব থেকে বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হবেন। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এই উদ্দেশ্যে তিনি দোয়া করতেন যে হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে নিজের কৃতজ্ঞ বান্দা এবং অধিকহারে খোদাকে স্মরণকারী বানিয়ে দাও।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৫১০)

আরও একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যে আমি তোমার সব থেকে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে উঠি এবং তোমার উপদেশ পালনকারী ও স্মরণকারী হই।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৬)

কতই না বিনয়পূর্ণ নিবেদন। পৃথিবীর সব থেকে কৃতজ্ঞ বান্দা এই দোয়া করছে যে সে যেন সব থেকে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়।

একবার আঁ হযরত (সা.) রুটির একটি টুকরোর উপর খেজুর রেখে খাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, এই খেজুরটিই রুটির তরকারি এবং এই নিয়েই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৩৮৩০)

প্রায় সময় এমন হত যে সিরকা বা পানি দিয়েই তিনি রুটি খেতেন আর এতেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

(সহী আল আসার ও জামীলুল ইবর মিন সীরাতি খায়রুল বাশার, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে যারা উৎকৃষ্টমানের খাদ্য পেয়েও নানান নাটক করে। সংসারে অনেক মনোমালিন্য এই কারণে তৈরী হয় যে বউ ভাল খাবার রান্না করে নি।

এরপর মক্কা বিজয়ের সময় আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত ছিল সর্বোচ্চ মানের। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে আঁ হযরত (সা.) যখন যুত তুয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন লাল ইয়েমেনি কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে উটের উপর থেমে যান এবং আল্লাহ্ তা'লা যে তাঁকে বিজয় দান করে কতটা সম্মানিত করেছেন একথা চিন্তা করে হুযুর (সা.) বিনয় ও কৃতজ্ঞতাপূর্বক এতটা নতমস্তক হয়ে যান যে মনে হচ্ছিল তাঁর কেশগুচ্ছ উটের কুঁজকে স্পর্শ করে ফেলবে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৪৬)

তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আরও একটি উচ্চমানের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যখন মক্কার মুসলমানদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতন করা

হল, মুসলমানেরা তখন ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করলেন আর ইথিওপিয়ার বাদশাহ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন। আঁ হযরত (সা.) নাজাশী বাদশাহর এই উপকার চিরকাল মনে রেখেছিলেন। তাই নাজাশী বাদশহার প্রতিনিধি দল একবার যখন আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে এল, সেই সময় রসুলুল্লাহ (সা.) তাদের অভিবাদন জানাতে নিজে দাঁড়িয়েছিলেন। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে রসুলুল্লাহ (সা.) এঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমরাই যথেষ্ট। আমরা তাদের আপ্যায়নও করব আবার অভ্যর্থনাও জানাব। আপনি কেন কষ্ট করছেন? আঁ হযরত (সা.) বললেন, এরা আমাদের সঙ্গীদের প্রতি অসাধারণ ভাল আচরণ করেছিল, সম্মানের সঙ্গে তাদের কাছে রেখেছিল। তাই আমি পছন্দ করব তাদের এই উপকারের প্রতিদান যেন নিজে শোধ করি।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২)

তাই সেই সব লোক যারা এখানে হিজরত করে এসেছেন, তাদের জন্যও এতে শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে যে, এই সব সরকার যারা এখানে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়ে সব রকমের সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক এই দেশগুলির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থকে কাজে লাগান এবং এদেরকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করুন, কেবল মৌখিকভাবেই নয়, বরং এই শিক্ষাকে তাদের সামনে বাস্তবায়িত করে দেখান যে প্রকৃত ইসলাম কি। আর সব সময় স্মরণ রাখবেন আমরা এদের কোনও প্রকারের ক্ষতি করব না বা অবৈধ উপায়ে আর্থিক মুনাফা অর্জন করব না বা কোনও সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করব না। আঁ হযরত (সা.) -এর মাধ্যমে আমরা যে ধর্মকে পেয়েছি আর যেভাবে আমরা প্রতিটি নৈতিক আচরণের গভীরতা এবং মান সম্পর্কে জেনেছি, এর জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"এটি আল্লাহ্ তা'লার পরম কৃপা যে তিনি আমাদেরকে নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে কোনও পরিশ্রম ছাড়াই পরিপূর্ণ বিশ্বাসের পথ দেখিয়েছেন।" কোনও পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই আমাদেরকে সহজ পথ দেখিয়েছেন। " সেই পথ যা আপনাদেরকে এই যুগে দেখানো হয়েছে, অনেক আলেম আজও তা থেকে বঞ্চিত। তাই খোদা তা'লার এই কৃপা ও পুরস্কারের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর কৃতজ্ঞতা হল এই যে সত্যনিষ্ঠভাবে সেই সব পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর যেগুলি সহী আকায়েদের পর দ্বিতীয় স্থানে আসে। আর নিজের কর্মগত অবস্থা থেকে সাহায্য নিয়ে দোয়া চাও যে আল্লাহ্ যেন সহী আকীদার উপর অবিচল রাখেন এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের তওফীক দান করেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৯-১৫০)

এটিই হল একজন আহমদীর প্রকৃত কৃতজ্ঞ হওয়ার পদ্ধতি।

আরও একটি নৈতিক বৈশিষ্ট হল আমানত রক্ষা করা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

এবং যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অঙ্গীকার সমূহের প্রতি যত্নবান। (আল মোমেনুন: ৯)

দেখার বিষয় এই যে কিভাবে আমরা এগুলি পুর্ণ করছি। এর সর্বোৎকৃষ্ট মান আঁ হযরত (সা.) কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সামনে নিজের আদর্শ রেখে গেছেন তা একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইসলামী সেনারা যখন খায়বারকে ঘিরে ফেলল, সেই সময় সেখানকার এক ইহুদী নেতার ভৃত্য, যে কিনা একজন মেষপালক ছিল, সে পশুপাল সহ ইসলামী সেনার এলকায় ঢুকে পড়ে এবং মুসলমান হয়ে যায়। সে আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল যে, হে রসুলুল্লাহ্! আমি তো এখন মুসলমান হয়ে গেছি, আমি কোনওমতেই ফিরে যেতে চাই না। ফিরে গেলে আমার উপর নির্যাতনও হবে। এই মেষপাল নিয়ে আমি এখন কি করব? এটি ইহুদীর মেষপাল, এদের মালিক ইহুদী। আঁ হযরত (সা.) বললেন, এই মেষপালের অভিমুখ দুর্গের দিকে ঘুরিয়ে হাঁকিয়ে দাও। এরা নিজেরাই মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে। এমনটিই হল, দুর্গবাসীরা তাদের ছাগলগুলি নিয়ে নিল।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫১৭)

এই হল বিশ্বস্ততা ও সততার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যখন কিনা শত্রুপক্ষের সম্পদ করায়ত্ত হয়েছে, কিন্তু আঁ হযরত (সা.) মুসলমান হওয়া সেই ব্যক্তিকে যে প্রথম পাঠ দিলেন তা হল একজন মুসলমানের বিশ্বস্ততা এবং সততার মান অতীব উচ্চ মানের হওয়া বাঞ্ছণীয়। এই সম্পদে না তোমার বা আমার কারোর কোনও অধিকার নেই। এদেরকে নিজেদের মালিকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। অধুনাকালের উন্নত সমাজে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পৃথিবীর কোথাও এই মান লক্ষ্য করা যাবে না। যারা ইসলাম এবং ইসলামের শিক্ষার উপর আপত্তি করে, তারাই সব থেকে বেশি বিশ্বাসভঙ্গের কাজে লিপ্ত থাকে।

এরপর প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রসঙ্গ এলে শত্রুরাও বলতে বাধ্য হয় হবে যে তিনি (সা.) প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি বদ্ধপরিকর ছিলেন। হারকিল বাদশহার দরবারে আবু সুফিয়ান একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত এই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নি।'

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়া সীর, হাদীস-১৭৭৩)

এরপর হুদাইবিয়া সন্ধির সময় যখন চুক্তিপত্র লেখা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় শেকলাবদ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়, যে কিনা মুসলমান হওয়ার কারণে শেকলে বন্দী হয়েছিল এবং সেখানে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল। কিন্তু তার পিতা সেখানে উপস্থিত ছিল, যে মুসলমান ছিল না। সে আঁ হযরত (সা.) কে বলল এখন আমাদের মাঝে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে যে আমাদের কোনও ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে যাবে না। তাই যদিও সে সে আপনার আশ্রয় লাভের জন্য ভিক্ষা চাইছে, তবু আপনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। সেই ব্যক্তি এ নিয়ে প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দেয় যে আমাকে কি কাফেরদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে যাতে তারা আমাকে কষ্ট দেয়। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) উত্তর বললেন, হ্যাঁ এখন চুক্তি হয়ে গেছে। যদিও সেই সময় তখনও চুক্তির লেখা হচ্ছিল। কিছু শর্ত লেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাক্ষর হওয়ার পূর্বেই তিনি বললেন, যেহেতু লেখা হয়ে গেছে তাই বৃহত্তর স্বার্থের কারণে এবং এই চুক্তির স্বার্থে তোমাকে উৎসর্গিত হতে হবে। তাই তুমি ফিরে যাও। কিন্তু তিনি সঙ্গে একথাও বলে দিলেন, তুমি কিছু দিন ধৈর্য ধর, আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে খোদা তা'লা তোমার জন্য স্বাচ্ছন্দ তৈরী করবেন। তিনি (সা.) বললেন, এই চুক্তির কারণে আজ আমি নিরুপায়, কেননা আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫০৪)

প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে এটি ছিল তাঁর মান। বর্তমানকালে দেশের শাসকরা এর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। আজ একটি চুক্তি হল, আগামী কাল সেটি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু এরই সঙ্গে আমাদেরকেও

শেষাংশ ১৭ পাতায়....

ইমামের বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Murshidabad.

শ্রেষ্ঠ রসূল হিসেবে আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদা

মূল রচনা: হযরত মুসলেহ মওউদ খলীফাতুল মসীহুস সানী (রা.)

এই প্রবন্ধটি সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর তফসীরে কবীর ১০ খণ্ড, সূরা কওসার-এর তফসীর থেকে সংগৃহীত। তিনি সূরা কাউসারের ব্যাখ্যায় আঁ হযরত (সা.) এর নবুয়তের যে ঔৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন তা পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হল। (সম্পাদকীয়)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

প্রথম অর্থ (কওসার-এর) ছিল নবুয়তের উৎকৃষ্ট গুণাবলী সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা এবং অত্যাধিক হারে থাকা। এই বিষয়টির ব্যাপকতার কোনও সীমা নেই আর খোদা তা'লা ছাড়া এটি অন্য কেউ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারবে না। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কথা বর্ণনা করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমাদেরকে সর্বপ্রথম এটি দেখা উচিত যে আঁ হযরত (সা.)-এর দাবি কি ছিল? কেননা কোনও ব্যক্তির গুণাবলী জানতে হলে তার দাবি কি, তা জানা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ কোনও ব্যক্তি যদি আমার কাছে এসে বলে, 'আমি সব থেকে বড় শিক্ষক'- সেক্ষেত্রে আমি দেখব যে শিক্ষক হওয়ার জন্য যাবতীয় শর্তাবলী তার মধ্যে পূর্ণ হচ্ছে কি না। যদি অন্যদের তুলনায় সেই শর্তগুলি তার মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকে, তবে আমি স্বীকার করে নিব যে সে সব থেকে বড় শিক্ষক। কিন্তু যদি কেউ বলে যে সে সব থেকে বড় শিক্ষক, আর যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে তার মধ্যে কি উৎকৃষ্ট গুণাবলী রয়েছে আর ধরে নেওয়া যায় যে যদি সে উত্তর দেয়, 'আমি অনেক ডিম খেতে পারি'- তবে সকলেই তাকে নির্বোধ মনে করবে। ...... সকলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। কিন্তু যদি সে বলে, 'আমি বড় যোদ্ধা; খাবার বেশি খাই, বেশি ভর বহন করতে পারি, বেশি ডন লাগাতে পারি এবং বিভিন্ন প্রকারের শারিরিক কসরত দেখাতে পারি, তখন আমরা বলব যে সে ঠিক বলছে। তখন আমরা তাকে একথা জিজ্ঞাসা করব না যে সে কি কেনথের দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে জানে? আর যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে নিই যে কেনথের দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে জানে কি না, তবে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, "দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক। আমি তো পালোয়ান হওয়ার দাবি করেছি, দার্শনিক হওয়ার দাবি করিনি।" তাই মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) যখন বললেন তিনি সব থেকে মহান, তখন আমাদের দেখতে হবে যে তাঁর দাবি কি এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁর দাবির অন্তর্ভুক্ত, যাতে আমরা তার সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর তুলনা করে দেখি এবং জানতে পারি যে তিনি সত্যিকার অর্থেই তিনি মহান কি না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি যে রসুল করীম (সা.) -এর দাবি কি ছিল, তখন কুরআন করীমের এই আয়াতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যায়।

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ○

(মুযাম্মিল: ১৬)

অর্থাৎ হে লোকসকল! আমরা তোমাদের প্রতি এক ব্যক্তিকে রসূল করে পাঠিয়েছি, যে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক, এবং ঠিক তদনুরূপ রসূল যেভাবে আমরা ফেরাউনের প্রতি মুসা (আ.) কে রসূল করে পাঠিয়েছিলাম। পৃথিবীতে যতসংখ্যক রসূল গত হয়েছেন, তাদের মধ্যে পরিচিত নবী মূসার নবুয়তের ধারার নবীগণই রয়েছেন। হযরত কৃষ্ণ এবং হযরত রামচন্দ্র (আ.) -এর নবুয়তকে অন্যান্য মুসলমানেরা স্বীকারই করে না। আমরা করি, কিন্তু আমাদের কাছে তাদের ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। তাঁদের শিক্ষামালা কি ছিল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা কিছুই জানি না। কেবল গীতা এমন গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে যেটিকে হযরত কৃষ্ণ (আ.)-এর সঙ্গে জুড়ে দেখা হয়। কিন্তু তাতেও সাধারণত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনাই রয়েছে। তাঁর দাবির বিবরণ তা থেকে পাওয়া যায় না। যাইহোক ইসরাঈলী নবী, যাদের ইতিহাস কিছুটা হলেও সংরক্ষিত আছে, তাঁদের শিরোমনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.) । আল্লাহ্ তা'লা রসুল করীম (সা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমিও মূসা সদৃশ নবী। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) সেই শ্রেণীর নবীর অন্তর্ভুক্ত যে শ্রেণীতে আঁ হযরত (সা.) পড়েন। এখন স্পষ্টতই হযরত মূসা (আ.)কে নবুয্যতের যে ঔৎকর্ষ দান করা হয়েছিল, যদি মহম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) এর ঔৎকর্ষ তাঁর থেকে অধিক প্রমাণিত হয়ে যায় তবে আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হবে যে রসুল করীম (সা.) কাওসারের অধিকারী। কেননা খোদা তা'লা কেবল একথাই বলেন নি যে, হযরত মূসা এবং আঁ হযরত (সা.) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতা হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ যে বস্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ প্রাপ্ত হয়েছেন তা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠতাও তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, বরং তার থেকে অধিক প্রাপ্ত হয়েছেন। এখন দেখব যে হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। এরপর আমরা সেগুলিকে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনা করে দেখব, যাতে আমরা জানতে পারি যে রসুলুল্লাহ (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা কোন কোন উপায়ে কাওসার দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে দেখি তখন জানতে পারি যে,

১) হযরত মূসা (আ.) ঐশী বাণীর প্রচার, এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান শেখাতে এসেছিলেন। আর স্পষ্টতই এই কাজে পার্থিব জ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। জ্ঞানের কথা শেখানো শিক্ষিত মানুষদের কাছে খুব সহজ কাজ। তাই হযরত মূসা (আ.)কে যখন নবী করে পাঠানো হল, তখন তিনি শিক্ষিত ছিলেন। কুরআন করীম এবং তওরাত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) কে যখন নবীদের কাজ অর্পন করা হয়, তখন জাগতিক অস্ত্র তাঁর হাতেই ছিল। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং নিজের কাজ ভালভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) -এর দায়িত্বে যখন সেই একই কাজ দেওয়া হল, তখন তিনি স্বাক্ষর ছিলেন না। কিন্তু নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি মূসা (আ.)-এর থেকে বেশি সফলতা অর্জন করেছেন, যেটি মূসা (আ.)-এর থেকে তাঁর অনেক বড় শ্রেষ্ঠত্ব।

২) হযরত মূসা এমন এক জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন যা সভ্য ও শিক্ষিত ছিল। তিনি যখন মিশরে আসেন সেই সময় মিশরীয় জাতি সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি হিসেবে গণ্য হত, আর

যেহেতু বনী ইসরাঈলরাও তাদের সঙ্গে থাকত, তাই ইসরাঈলী জাতিও শিক্ষিত ছিল। আর সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদেরকে ধর্মের জ্ঞান শেখানো অনেক সহজ। তাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং সাংগঠনিক চেতনাবোধ তৈরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এমন এক জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন যারা ছিল অসভ্য ও বর্বর, জাগতিক জ্ঞানের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। হযরত উমরের যুগের একটি ঘটনা রয়েছে যে, মুসলমানরা যখন পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন একবার পারস্য সম্রাট তার সভাপরিষদ দেরকে আদেশ দিলেন, " তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। মনে হচ্ছে তোমরা এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর না। আমি এদেরকে অর্থ দিব, যা পেয়ে তারা খুশি মনে ফিরে যাবে। পারস্য সম্রাট ইসলামী সেনাদলের সেনাপতিকে বলে পাঠাল যে আমার কাছে নিজের কোনও প্রতিনিধি পাঠাও। সেই প্রতিনিধি দল সম্রাটের দরবারে এলে সম্রাট বলল, "তোমরা বর্বর, মৃতভক্ষনকারী, গোসাপ ভক্ষনকারী- রাজত্বের সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্পর্ক? আমি তোমাদেরকে অর্থ-সম্পদ দিচ্ছি, তোমরা ফিরে গিয়ে সেগুলি খরচ কর এবং বাড়িতে বসে সুখের জীবন কাটাও। যদি তোমরা ফিরে যেতে সম্মত হও তবে কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের প্রত্যেক অফিসারকে দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা এবং সেনাদের একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করব। সম্রাটের কথা শেষ হলে প্রতিনিধি দলের নেতা, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। আমরা সত্যিকার অর্থেই অসভ্য ও বর্বর ছিলাম। আমরা মৃতভক্ষনকারী ছিলাম, গোসাপ খেতাম। আমরা এতীমদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতাম, মায়েদের সঙ্গে বিবাহ করতাম, আমাদের মধ্যে যাবতীয় প্রকারের দোষত্রুটি ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে একজন রসূলকে প্রেরণ করলেন যাকে আমরা মান্য করেছি। তাই আমাদের অবস্থা এখন ভিন্ন, আমরা এখন আর তেমনটি নেই, যেমনটি পূর্বে ছিলাম। এখন আমরা এই ধরণের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিব না। আমাদের ও তোমাদের মাঝে যুদ্ধ চলছে। এখন এর মীমাংসা হবে যুদ্ধের ময়দানে, স্বর্ণমুদ্রা ও প্রলোভনে নয়। হয় আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব কিম্বা নিজেরাই যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাব। বাদশাহ তার ভৃত্যকে নির্দেশ দিল, যাও, একটি মাটি ভর্তি বস্তা নিয়ে এস। ভৃত্য একটি মাটির বস্তা নিয়ে এল। সম্রাট সেই সাহাবীকে বলল একটু এগিয়ে এস। তিনি এগিয়ে এলে বাদশাহ তার ভৃত্যকে বলল মাটির বস্তাটি এর মাথায় চাপিয়ে দাও। সেই সাহাবী অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনম্রভাবে আনত হয়ে বস্তাটি নিজের মাথায় তুলে নিলেন। বাদশাহ বলল , যাও, আমি তোমাকে কিছুই দিতে প্রস্তুত নই। তোমার উপর আমি এই মাটি চাপিয়ে দিলাম। সেই সাহাবী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং সেখান থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং নিজ সঙ্গীদেরকে বললেন, দেখ বাদশাহ নিজের হাতে ইরানের মাটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। বাদশাহ পৌত্তলিক ছিল, আর পৌত্তলিক স্বভাবত সন্দেহপ্রবণ হয়ে থাকে। সেই এই কথা শুনে কেঁপে উঠল এবং দরবারিদেরকে বলল দৌড়ে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। কিন্তু ততক্ষণে তারা ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। মোটকথা হযরত মূসা (আ.) যে জাতি এবং দেশে কাজ করেছেন, সেই জাতি ও দেশ সব থেকে বেশি সভ্য ছিল। তাদের যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই যুগের অট্টালিকাগুলিকে ধরুন, সেগুলির তুলনায় বর্তমান যুগের অট্টালিকাগুলি তুচ্ছ মনে হয়। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এলে দেখব, তারা মৃতদেরকে মশলা মাখিয়ে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছে যে এখনও সেগুলি জীবিত বলে মনে হয়। আমি নিজেও মমি দেখেছি, সেগুলির উপর আচ্ছাদন সরিয়ে দিলে মনে হবে যেন কোনও মানুষ ঘুমিয়ে আছে। কেবল কিছুটা শুকিয়ে গেছে, এই যা। ইউরোপবাসী আজও চেষ্টা করে চলেছে তারাও যেন এমনটি করতে পারে, কিন্তু সফল হয় নি। এখন তারা মমি থেকে মশলা বের করে সেগুলিকে পরীক্ষা করেছে এবং মৃতদেহ সংরক্ষণে অনেকাংশেই সফল হয়েছে। তবুও তাদের মশলা কেবল দশ বারো বছর পর্যন্তই স্থায়ী হয়। কিন্তু মিশরীয় মৃতদেহগুলি হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষিত আছে। ৩৪০০ বছর, বরং এর থেকেও প্রাচীন মৃতদেহ আজও সংরক্ষিত আছে। তারা কতটা উন্নতি করেছিল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান যুগের কোনও জাতিই করতে পারে নি। এছাড়াও মিশরীয়দের মধ্যে স্বর্ণের কারুকার্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল, যা তাদের উন্নতির এক স্পষ্ট প্রমাণ। এর থেকে অনুমান করা যায় যে মিশরীয় জাতির সঙ্গে বসবাসকারী মানুষেরা কত সভ্য এবং উন্নত ছিল। তাই হযরত মুসা (আ.) সেই জাতির সঙ্গে কাজ করেছেন যারা সভ্য ছিল এবং জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) সেই জাতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন যারা নিজেদের মায়েদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতে জানত না, বরং তাদেরকেই বিয়ে করে নিত, এছাড়াও অন্যান্য আরও দোষও তাদের মধ্যে পাওয়া যেত। তথাপি তিনি নিজের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন, এমনকি হযরত মূসা (আ.)-এর থেকেও বেশি সফল হয়েছেন।

৩) হযরত মূসা (আ.) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'লাকে তিনি বললেন, 'এটি বিরাট বড় কাজ, আমার দ্বারা এটি হবে না। আমার সঙ্গে আরও একজন ব্যক্তিকে সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত করুন'। এছাড়াও তিনি এও বলেছেন , "وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ-অর্থাৎ সেই সাহায্যকারী যেন আমার আত্মীয়দের মধ্য থেকেই হয়।" হযরত মূসা (আ.)-এর চেতনাবোধ দেখুন, যখন খোদার পক্ষ থেকে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি বললেন, 'এই কাজ আমি করতে পারব না।' খোদা তা'লা তাঁর উপর একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন, আর তিনি করতে অস্বীকার করলেন। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে এটি ছিল বিনয়। কিন্তু বিনয়েরও কোনও সীমা থাকা দরকার। খোদা তা'লা বার বার তাঁকে বললেন, তুমি ফেরাউনের দিকে যাও, কিন্তু যেমনটি তওরাত থেকে জানা যায়, তিনি উত্তরে অস্বীকারই করতে থাকেন। অতঃপর নিজের সঙ্গে একজন সহায়ক দাবি করে জেদ ধরা এবং এমন দাবি করা যে সে যেন তাঁর আত্মীয়ই হয়- এর থেকে প্রমাণ হয় যে হযরত মূসা (আ.) খোদা তা'লার আদেশ সত্ত্বেও পার্থিব উপকরণের সাহায্য নিতে চাইছিলেন। এর বিপরীতে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), যিনি নবুয়তের যুগ থেকে বহু দুরে ছিলেন, [মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছাকাছি সময়েই হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ ও প্রমুখ বহু নবী গত হয়েছিলেন। কিন্তু

ইমামের বাণী

ইসলামকে অনেক দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। সেই শরৎ অতীত হয়েছে, এখন বসন্ত এসেছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) -এর ২৫০০ বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) এসেছিলেন। এরপর তাঁর জাতিতে কোনও নবী আসেন নি] কিন্তু তাঁর মারেফাত দেখুন, তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে ‘একরা’ বললেন, যার অর্থ হল তুমি পাঠ কর। রসুল করীম (সা.) বললেন, ‘মা আনা বি কারিইন’। আমি স্বাক্ষর নই, লেখাপড়া জানি না। এর অর্থ এই নয় যে তাঁকে কোনও বই পড়তে হত। জিবরাইল (আ.) -এর কাছে কোনও গ্রন্থ ছিল না যা তাঁকে পড়তে বলতেন। আর কেউ যখন গ্রন্থ ছাড়া সামনে এসে বলে যে পাঠ কর, তখন তার অর্থ হল- আমি যা বলছি তার পুনরাবৃত্তি করতে থাক। যখন তাঁকে ফিরিশতা বলল পাঠ কর, তখন এর অর্থ ছিল, “হে ব্যক্তি! (সেই সময় তিনি নবী ছিলেন না) যা কিছু আমি বলব তুমি সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাক।” কিন্তু তিনি (সা.) বললেন, “আমি তো পড়ালেখা জানি না।” এটি ছিল তাঁর বিনয়। তিনি মনে করতেন, আমার উপর কোনও বড় কাজের দায়িত্ব আসতে চলেছে, কিন্তু খোদা তা’লা বড়ই মহিমাময় আর আমি তাঁর একজন দুর্বল বান্দা। হতে পারে আমি সেই কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পাদান করতে পারব না।” তাই তিনি বললেন, “আমি স্বাক্ষর নই। ” ফিরিশতা তাঁকে দ্বিতীয়বার বললেন-‘পাঠ কর’। তিনি পুনরায় উত্তর দিলেন- ‘মা আনা বি কারিইন’- আমি পড়তে জানি না। তৃতীয়বার ফিরিশতা বললেন, ‘তুমি পাঠ কর’- এবার তিনি পাঠ করতে শুরু করলেন। এটি হল বিনয়। মূসা (আ.)-এর ন্যায় তিনি বার বার অস্বীকার করতে থাকেন নি। তিনি যখন উপলব্ধি করলেন যে খোদা তা’লা এই দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত করতে চান, তখন তিনি অবিলম্বে সেই আদেশ শিরোধার্য করলেন এবং বুঝলেন, এখন অস্বীকার করা অশিষ্টতা ও অবাধ্যতার নামান্তর। এরপর তিনি একথা বলেন নি যে, ‘আমাকে কোনও সাহায্যকারী দিন’ বরং বললেন, “যখন খোদা তা’লার এটিই ইচ্ছা যে আমি এই বোঝা বহন করি, তবে তা একাই বহন করব।” এটি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করে। মূসা (আ.)কে ছোট্ট একটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল, আর তাতেও তিনি সাহায্যকারী চাইলেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এর থেকে অনেক বড় দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি বললেন, “আমি একাই এই কাজ সম্পাদান করব।” আর তিনি সেই কাজ সফলভাবে সম্পাদান করেছেন। এটি কত বড় শ্রেষ্ঠত্ব যা তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর উপর লাভ করেছিলেন।

৪) যেমনটি কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয়, হযরত মূসা (আ.) যখন নিজের দেশ ত্যাগ করলেন, তখন ফেরাউন তাঁর পিছু ধাওয়া করল। তাঁর জাতি ভীষণভাবে ভয়বিহ্বল হয়ে পড়েছিল এবং ধরেই নিয়েছিল যে এখন তারা ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। তাই তো তারা সজোরে চেঁচিয়ে বলেছিল- ‘ইন্না লা মুদরাকুন’ (শোরা:৪) ‘হে মূসা আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।’ একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) বললেন, ‘কাল্লা ইন্না মাঈ রাব্বী সাইয়াহদীনী’ (শোরা: ৪) অর্থাৎ এমনটি কোনওভাবেই হতে পারে না। খোদা তা’লা আমার সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদেরকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।’ খোদা তা’লা তাদেরকে বিপদমুক্ত রাখেন এবং ফেরাউন তার সৈন্যসামন্তসহ সলিল সমাধি নেয়।

অনুরূপভাবে রসুল করীম (সা.) যখন হিজরতের সময় মক্কা থেকে বের হয়ে ‘সওর’ গুহায় আশ্রয় নিলেন, তখন শত্রুরা একজন বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধানীর দিক-নির্দেশনায় তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সেই গুহার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এসে পৌঁছয় যেখানে রসুল করীম (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.)-এর সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময় অনুসন্ধানী তাদেরকে বলেছিল, মহম্মদ (সা.) নিশ্চয় এখানে লুকিয়ে আছেন। আর যদি তিনি এই গুহায় না থাকেন তবে আকাশে চলে গেছেন। শত্রুরা সেই সময় তাঁর এত কাছে ছিল যে হযরত আবু বাকার (রা.), যিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তিনিও ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, “হে রসুলুল্লাহ ! শত্রুরা এতটা কাছে চলে এসেছে যে তারা একটু মাথা নুইয়ে ভেতরে উঁকি মারলেই আমাদের দেখতে পাবে।” তিনি (সা.) সেই সময় অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে উত্তর দিলেন- ‘আবু বাকার! ভয় পাচ্ছ কেন? ‘ইন্নাল্লাহা মাআনা’ - আল্লাহ তা’লা আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।” তাই শত্রুরা একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়, আঁ হযরত (সা.) কে ধরতে ব্যর্থ হয়। যদিও হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন, “আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।” কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে হযরত মূসার (আ.) শত্রুদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এমন এক ঘটনা যা নিয়ে শত্রুরা আজও দাবি করে থাকে যে হযরত মূসা এবং তাঁর জাতি সমুদ্র পার করেছিল এমন এক সময় যখন কি না ভাটার স্রোত চলছিল। যখন জোয়ার এল তখন ফেরাউন এবং তার সঙ্গীদের সলিল সমাধি হল। এর মধ্যে অলৌকিক নিদর্শনের মত বিষয় কোথায়? কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা.) কে খোদা তা’লা এমনভাবে রক্ষা করেছিলেন যে শত্রুরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে গুহাদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে দেখতে পায় নি। যদিও তাদের বিশ্বস্ত অনুসন্ধানী সঙ্গে ছিল এবং সে বলেওছিল যে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) নিশ্চয় এখানে আত্মগোপন করেছেন। যদি এখানে না থাকেন তবে আকাশে আরোহন করেছেন। কিন্তু সে এতটা জোর দিয়ে বলাতেও শত্রুরা সামান্য মাথা নীচু করে গুহায় প্রবেশ করে ভেতরে দেখার কষ্টটুকু করতে পারে নি। তারা বিফলমনোরথ হয়েই ফিরে গিয়েছিল।

এরপর রসুল করীম (সা.)কে গ্রেপ্তার করার জন্য মক্কার কাফেররা একশ উঁট পুরস্কার ধার্য করে। এটি এতবড় পুরস্কার ছিল যে তা অর্জনের জন্য আরবের লোকেরা চতুর্দিকে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে, যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) কে কোথাও পাওয়া যায় তবে একশ উট পাওয়া যাবে আর পরিবারের আর্থিক অবস্থা পাল্টে যাবে। উট সেই সময়ের নিরিখে বড় পুরস্কার ছিল, এমনকি এটি আজকের সময়ের নিরিখেও বড় পুরস্কার। বর্তমান যুগে সরকার অপরাধীদের ধরতে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত পুরস্কার নির্ধারণ করে। যদি সেই যুগের নিরিখে একশটি উটের মূল্য অনুমান করা যায় তবুও তা প্রায় ষাট সত্তর হাজার টাকা দাঁড়ায়।

ইমামের বাণী

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এটি এমন আশিসময় ইবাদত যা বান্দার সঙ্গে স্রষ্টার মিলন সাধন করে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

মোটকথা এটি অনেক বড় পুরস্কার ছিল যা লাভের জন্য অনেকেই বের হয়েছিল, কিন্তু এক ব্যক্তি দৈবক্রমে সেই পথে এসে পড়ে যে পথে রসুল করীম (সা.) মদীনা যাচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.) কে দেখে মনে করল যে সে তাঁকে ধরতে সফল হবে। যে সময় সে তাঁর নিকট পৌঁছল, হঠাৎ করে তার ঘোড়া হোঁচট খেল আর তার পাগুলি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে গেল। তখন সে অবিলম্বে আরবের প্রাচীন রীতি অনুসারে তীর বের করে ভাগ্য নির্ধারণ করল যে তার এগিয়ে যাওয়া উচিত কি না। ভাগ্য তাকে নির্দেশ করল যে আগে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু একশটি উট পুরস্কারের লোভ সে সংবরণ করতে পারল না। পুণরায় সে জোর খাটিয়ে কাছে পৌঁছল কিন্তু সেই আবারও ঘোড়া হোঁচট খেল আর এবার সে পেট পর্যন্ত মাটিতে ঢুকে গেল। সে ত্রস্ত হৃদয়ে উপলব্ধি করল যে ব্যাপারটা অন্য রকম ঠেকছে। তাই সে রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে অত্যন্ত শিষ্টভাবে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, "আমি নিরাপত্তা চাই। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে আপনি খোদার নবী। আমি আপনার পিছু ধাওয়া করতে করতে এতদূর এসেছিলাম, কিন্তু ফিরে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে আপনি খোদার সত্য নবী। আর আপনি যেহেতু খোদার সত্য নবী তাই একদিন অবশ্যই আপনি জয়ী হবেন। তাই আমি চাই আপনি আমাকে একটি কাগজের টুকরোতে লিখে দিন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যেদিন বিজয় দান করবেন, সেদিন যেন আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়। রসুল করীম (সা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আবু বাকার (রা.) কে নির্দেশ দিলেন একটি কাগজে লিখে দিতে যে খোদা তা'লা যেদিন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন, সেদিন যেন এই ব্যক্তির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-কে হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় কেবল একটি মাত্র ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় নি। তাঁর সঙ্গে দু'বার এমন ঘটনা ঘটেছে যখন শত্রু তাঁকে ধরার চেষ্টা করেছে, দু'বারই তারা ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও ফেরাউন নিজের সৈন্যসামন্তসহ যখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু নিয়েছিল, তখন সে তাঁকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু রসুল করীম (সা.) -এর শত্রু কাছে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বে তাঁকে দেখতেও পায় নি। দ্বিতীয় বার শত্রু যখন তাঁকে ধরতে চাইল তখনও সে ব্যর্থ হয়েছিল। আর কেবল ব্যর্থই হয় নি, বরং সে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেছিল। এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু ফেরাউন খোদা তা'লাকে সেই সময় দেখতে পেয়েছিল, যখন সে ডুবতে বসেছিল। কুরআন করীমে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে যখন ফেরাউনের জলমগ্ন হওয়ার উপক্রম হল, তখন সে বলল, "আমি মূসা এবং হারুনের খোদার উপর ঈমান আনছি।" এর উত্তরে খোদা তা'লা বললেন, "তুই শেষ মুহূর্তে ঈমান এনেছিস, এখন তোকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তোর পার্থিব দেহকে মুক্তি দেওয়া হবে যাতে তা অন্যদের জন্য শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।" কিন্তু রসুল করীম (সা.) কে ধরার জন্য যে শত্রু বের হয়েছিল সে জীবিত ছিল এবং নিজের জীবদ্দশাতেই সে স্বীকার করেছিল যে তিনি খোদা তা'লার সত্য নবী, এমনকি সে তাঁর কাছে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতিপত্রও আদায় করেছিল যে যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বিজয় দান করবেন, তখন যেন তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইসলামের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত জীবিত রাখেন আর মুসলমানেরা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। এটি কত বড় শ্রেষ্ঠত্ব যা রসূল করীম (সা.)কে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর প্রদান করা হয়েছিল।

৫) হযরত মূসা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যে আরও একটি পার্থক্য হল এই যে হযরত মূসার (আ.) শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শত্রুর ধ্বংস হওয়ার পরও সেই দেশে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যদিও কিছু অজ্ঞ আলেম এমন দাবিও করে যে হযরত মূসা (আ.) পরবর্তীকালে সেই দেশে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই অবধারণার মূলে রয়েছে একটি আয়াতের তাদের ভুল ব্যাখ্যা। কিন্তু এর কোনও ভিত্তি নেই, আর বাইবেল থেকেও এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মিশরে শাসনক্ষমতার দখল নিয়েছিলেন, এমন মৌখিক দাবি করে লাভ কি? বাস্তবে যেমনটি কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত, পরবর্তী কালে তিনি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং দীর্ঘকাল নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু রসুল করীম (সা.)-এর শত্রুরা যখন পরাজিত হল, তখন তিনি তাদের দেশের উপর রাজত্ব করলেন। এটিও হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

৬) হযরত মূসা (আ.) কে যখন তাঁর জাতি বলল,

اِذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (مائده ع4)

(মায়েদা: রুকু-৪)। তখন খোদা তা'লা বললেন, "হে মূসা, তোমার জাতি তোমার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে। এই দুর্ব্যবহারের কারণে আমি তাদেরকে সেই বিজয় থেকে বঞ্চিত রাখব যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন যাও, চল্লিশ বছর পর্যন্ত বনে জঙ্গলে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াও এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও। তবেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ক্ষমা করবেন।" তাই হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি চল্লিশ বছর পর্যন্ত বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর পর কেনান দেশে তাদের ঠাঁই হয়েছিল। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জাতি তাঁর মৃত্যুর বারো বছরের মধ্যেই সারা সভ্য জগতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটি একটি অনেক বড় শ্রেষ্ঠত্ব যা মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৭) আরও একটি বিশিষ্টতা হযরত রসুল করীম (সা.) হযরত মূসার তুলনায় অর্জন করেছিলেন তা হল এই যে হযরত মূসা (আ.)-এর (নবুয়তের) ধারাবাহিকতা ব্যহত হয়েছে। কিন্তু আঁ হযরত(সা.) এর (নবুয়তের) ধারাবাহিকতা কোনও দিন ব্যহত হবে না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে মূসার নবূয়তের ধারবাতিকতা হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বরং বলা যায় মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু কেবল নামেই। নচেত হযরত ঈসা (আ.) -এর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর অনুসারীরা বলতে শুরু করেছিল যে হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর থেকে বড়, বরং তারা তাঁকে খোদার পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে শুরু করেছিল। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধারাবাহিকতা কখনও ব্যহত হবে না, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

৮) হযরত মূসা (আ.)-এর শেষ খলীফা অর্থাৎ মসীহ নাসেরীর জামাত তাঁকে জবাব দিয়েছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। এক্ষেত্রে হযরত মসীহ (আ.)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত ভাষার মধ্যে কতিপয় দ্ব্যর্থবোধক বাক্যও এর জন্য কিছুটা দায়ী যা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সমস্ত কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়ত বা সংকল্পের উপর। প্রত্যেক মানুষ এই নিয়ত বা সংকল্প অনুযায়ীই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

তাঁর জাতিকে বিভ্রান্ত করেছিল, এবং তারা হযরত মূসাকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু আমাদের সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.), যিনি মহম্মদী সিলসিলার শেষ খলীফা, তিনি বলেছেন-

'ওহ হ্যা ম্যাঁ চিয কিয়া হুঁ, বাস ফায়সালা এহী হ্যায়।'

অর্থাৎ, "আমি যা কিছু গুণাবলী প্রাপ্ত হয়েছি তা সবই মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্বের কল্যাণে। একথা মনে করো না যে আমি তাঁর বিপরীতে কোনও মূল্য রাখি।" হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি নিজেকে খোদার পুত্র দাবি করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর শেষ খলীফা অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছেন-

'ওহ হ্যায় ম্যাঁ চিয কিয়া হুঁ, বস ফায়সালা এহি হ্যায়।'

অর্থাৎ, 'নিজ প্রভু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হতে পারে না' হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি কবিতার পঙক্তির উপর মানুষ আপত্তি করে কিন্তু আমি এটি পড়ে আনন্দিত হই। তিনি বলেন-

'ইবনে মরিয়ম কা যিকর ছোড়ো/ উস সে বেহতার গোলামে আহমদ হ্যায়।

এর উপর লোকেরা আপত্তি করে বলে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজেকে ইবনে মরিয়মের থেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করেছেন। অথচ তিনি নিজেকে ইবনের মরিয়মের থেকে শ্রেষ্ঠ বলেন নি, বরং আহমদ-এর গোলাম বা দাসকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আর এই দুটি কথার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এখানে আহমদ বলতে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে বোঝানো হয়েছে। তিনি (আ.) বলেছেন, ঈসা (আ.)-এর থেকে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসের মর্যাদাও বেশি। তাই যার দাস হযরত ঈসা (আ.)-এর থেকে পদমর্যাদায় বড় ও শ্রেষ্ঠ, সে তো নিজে তাঁর থেকে কয়েকগুণ শ্রেষ্ঠ হবে। এছাড়াও হযরত মূসা (আ.) এর উপর হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আরও একটি শ্রেষ্ঠত্ব হল মূসীয় সেলসেলার শেষ খলীফার জামাত হযরত ঈসা (আ.)কে নিজের সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার থেকে উত্তম আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর শেষ খলীফা তাঁর প্রভুর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পৃথিবীতে জোরালোভাবে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা কেবল রসুল করীম (সা.)-এর কল্যাণেই।

৯) হযরত মূসা (আ.)-এর পর যতজন নবী হয়েছেন, তারা প্রত্যেকে ছিলেন স্বতন্ত্র নবী। অর্থাৎ তাঁরা কোনও নতুন শরিয়ত না আনলেও নবুয়তের মর্যাদা সরাসরি নিজেরাই অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যম ছাড়াই এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মূসীয় শিক্ষা এমন ছিল না যা কাউকে নবুয়তের মর্যাদায় উপনীত করতে পারত। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর তাঁর উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যে, তাঁকে অনুসরণকারী ব্যক্তিরা নবী হবেন, তাঁর কল্যাণের ধারায় নবী হবেন। আর তাঁরা যা কিছু প্রাপ্ত হবেন মহম্মদের কল্যাণধারা থেকেই প্রাপ্ত হবেন। হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নবুয়তের মর্যাদা লাভ করেছিলেন সরাসরি এবং স্বতন্ত্রভাবে। মূসা (আ.)-এর শিক্ষায় এই বৈশিষ্ট্য ছিল না যা কাউকে নবুয়তের মর্যাদায় পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদে এই গুণ রয়েছে যে এর উপর অনুশীলন করলে মানুষ নবুয়তের মর্যাদাতেও পৌঁছে যেতে পারে। তথাপি সে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর অনুসারী এবং কুরআন করীমের সেবকই থাকবে।

১০) হযরত মূসা 'আসা' বা লাঠি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা কোনও কোনও সময় দংশনকারী সাপে পরিণত হত। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে কুরআনের অস্ত্র প্রদান করা হয়েছিল যা থেকে সব সময় আশীর্বাদ ও করুণাই উৎসারিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই অস্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন-

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

(ফুরকান, রুকু-৫) অর্থাৎ তুমি কুরআন করীম হাতে নিয়ে এর দ্বারা জিহাদ করে যাও। বাহ্যিক অস্ত্রের যুদ্ধ তো সাধারণ বিষয় যা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু কুরআন করীম এমন এক অস্ত্র যা শত্রুদের মোকাবেলায় সবসময় কাজে আসতে পারে এবং যার প্রভাব প্রকাশ পায় আশীর্বাদ রূপে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.)কে বারবার 'রহমতুল্লিল আলামীন' বা জগত সমূহের আশীর্বাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁকে শিক্ষাও এমন প্রদান করা হয়েছে যেখানে শাস্তি প্রদান এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চাইতে নম্রতা ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ.) এর শিক্ষা ছিল, যদি তোমাকে কেউ চড় মারে, তবে তুমিও তাকে চড় মার। যদি কেউ তোমার একটি চোখ উপড়ে দেয়, তবে তুমিও তার চোখ উপড়ে ফেল। যদি কোন ব্যক্তি তোমার দাঁত ভেঙে দেয়, তবে তুমিও তার দাঁত ভেঙে দাও। কিন্তু ইসলাম নির্দেশ দেয়, তোমরা যে কাজই কর, চিন্তাভাবনা করে কর এবং পরিস্থিতি বিচার করে কর। যদি ক্ষমা করার মধ্যে বিচক্ষণতা থাকে, তবে শত্রুকে ক্ষমা কর, শাস্তি দেওয়ার উপর জোর করো করো না। কেননা তোমাদের উদ্দেশ্য হল সংশোধন করা, প্রতিশোধ গ্রহণ নয়।

হযরত মূসা (আ.) 'শুভ্র হস্ত' এর নিদর্শন প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর হাত কখনও কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে 'সীরাজাম্মুনীরা' (উজ্জ্বল সূর্য) নামে অভিহিত করেছেন। সূর্য গোটাটাই প্রজ্জ্বলিত থাকে, কোনও অংশ বিশেষ প্রজ্জ্বলিত থাকে না। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর কেবল হাত দীপ্তি ছড়াতো, কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর সারা শরীর দীপ্তিময় ছিল। এছাড়া সূর্য সারাক্ষণ আলো দেয়, কখনও কখনও নয়। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর হাত কেবল কখনও কখনও উজ্জ্বল থাকত। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) সমস্ত বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন, সর্বকালের জন্য তাঁর পথপ্রদর্শন স্থায়ী থাকবে, এমন না যে কখনও শেষ হয়ে যাবে আবার কখনও আরম্ভ হবে।

১২) হযরত মূসা (আ.)কে কেবল বানী ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আমরা তোমাকে বিনাব্যতিক্রমে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি। (সূরা সাবা, রুকু-৩) এটিও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের একটি সুস্পষ্ট দলিল।

(তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৫১)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনে এগুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবে এবং এর বিকাশস্থল হওয়ার চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

LOVE FOR ALL RESTURANT

Sahadul Mondal
Mob.7427968628,9744110193
Kirtoniyapara
Murshidabad, W.B

মহানবী (সাঃ) এর প্রাথমিক জীবন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ (রা.) রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত

প্রারম্ভিক জীবন

পবিত্র জন্মক্ষণ

আমেনার নুর প্রকাশের সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল তথা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। তিনি বনু হাশিম উপকত্যায় বাস করতেন এবং সেখানে এই অপেক্ষায় ছিলেন যে তাঁর সন্তান জগতের আলোর মুখ দেখবে, যে তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতিকে জীবিত রাখবে এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি বয়ে আনবে। 'আসহাবে ফিল' -এর ঘটনার পঁচিশ দিন পর, ১২ই রবিউল আওয়াল, মোতাবেক ইং ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০ই আগস্ট, অথবা একটি সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে, হয়তো তা সবচেয়ে সঠিক, ৯ই রবিউল আওয়াল, মোতাবেক ইং ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সোমবার সকালে আঁ হযরত (সা.)-এর জন্ম হয়। আসহাবে ফিল' -এর এত কাছাকাছি সময় তাঁর জন্ম হওয়া, বিষয়টি নিজেই খোদার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত ছিল যে, যেভাবে তিনি কাবার উপর এই বাহ্যিক আক্রমণকে ব্যর্থ করেছেন, অনুরূপভাবে সময় এসেছে খোদার ধর্মের বিপরীতে মিথ্যার উপাসনাকে নির্মূল করার। কুরআন করীমেও আসহাবে ফীল-এর আক্রমণের উল্লেখ বাহ্যত এই উদ্দেশ্যেই লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক সন্তান ভূমিষ্ঠ হতেই আমিনা আব্দুল মুতালিবকে সংবাদ প্রেরণ করেন, যিনি শোনামাত্রই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমিনার কাছে চলে আসেন। আমিনা তাঁর সামনে ছেলেকে রেখে বলেন, 'আমি স্বপ্নে এর নাম মহম্মদ দেখেছিলাম।' আব্দুল মুতালিব শিশুকে তুলে নিয়ে বায়তুল্লাহ যান এবং খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ছেলেটির নাম রাখেন 'মহম্মদ', যার অর্থ অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য। এরপর তিনি প্রফুল্ল চিত্তে ছেলেটিকে মায়ের হাতে তুলে দেন।

ইতিহাসবিদগণ আঁ হযরত (সা.)এর জন্ম সম্পর্কে কিছু উদ্ভট উদ্ভট সব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন, সেই সময় ইরানের বাদশহার প্রসাদে প্রচন্ড ভূমিকম্প আসে যার ফলে এর চৌদ্দটি গ্যালারী খসে পড়ে এবং ফার্সিদের অগ্নি মন্দিরের পবিত্র অগ্নিকুন্ড সহসায় নিভে যায়, যা শত শত বছর থেকে অবিরামভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। কয়েকটি নদী এবং হৃদ শুকিয়ে যায়। এমনকি মহম্মদ (সা.)-এর নিজ গৃহেও বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই বর্ণনাগুলি সাধারণত নির্ভরযোগ্য নয়। এই বর্ণনাও পাওয়া যায় যে তাঁর জন্মের সময় আকাশে অস্বাভাবিক অধিক হারে উল্লাপাত লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যা সম্ভবত সঠিক ঘটনা। অনুরূপভাবে এই বর্ণনাও পাওয়া যায় যে আঁ হযরত (সা.) জন্মজাতভাবে খাতনাকৃত ছিলেন। একথা যদি সত্যিও হয়, তবে তা বিচিত্র কিছু নয়, অনেক সময় অন্যান্য শিশুদের মধ্যেও এই ধরণের প্রাকৃতিক ঘটনা দেখা গেছে। আরও একটি বিষয় তাঁর প্রকৃতিজাত ছিল, সেটি হল তাঁর পৃষ্ঠদেশের বামপার্শ্বে একটি স্ফীত মাংসপিণ্ড, যেটি মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ভাষায় 'নবুয়তের মোহর' নামে প্রসিদ্ধ।

বাল্যকাল ও প্রতিপালন

মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতে এমন এক রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে মায়েরা শিশুদেরকে বুকের দুধ পান করাতেন না, বরং সাধারণত শহরের বাইরের বেদুঈনদের মধ্য থেকে দাঈদেরকে শিশুদের দায়িত্ব দেওয়া হত। এর একটি উপকারও এই ছিল। জঙ্গলে খোলা বাতাসে থেকে সন্তান হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হত। এছাড়াও তারা আরবী ভাষাও শিখত উৎকৃষ্ট ও স্পষ্ট।

আঁ হযরত (সা.) কে প্রথমে তাঁর মা এবং পরে সুওয়াইবা দুধ পান করায়। সুওয়াইবা ছিল তাঁর চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী, যাকে সে ভাইপো জন্ম নেওয়ার আনন্দে মুক্ত করে দিয়েছিল। এই সুওয়াইবাই আবার হযরত হামযা (রা.)কেও দুধ পান করিয়েছিল। এইরূপে হামযা, যিনি তাঁর চাচা ছিলেন, দুধের সম্পর্কে তাঁর ভাই হয়ে গেলেন। সুওয়াইবার এই কয়েকদিনের সেবা আঁ হযরত (সা.) আজীবন স্মরণ রেখেছিলেন। যতদিন সে জীবিত ছিল, তিনি (সা.) সব সময় তাকে সাহায্য করতেন আর তার মৃত্যুর পরও তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে তার কোনও আত্মীয় জীবিত আছে কি না? কিন্তু জানা যায় যে কেউই জীবিত ছিল না।

সুওয়াইবার পর আঁ হযরত (সা.)কে দুধপানের দায়িত্ব স্থায়ীভাবে দেওয়া হয় হালীমাকে, যে ছিল হাওয়াযান জাতির বনু সাআদ গোত্রের এক মহিলা। অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মক্কায় দাঈ হিসেবে কোনও শিশুর খোঁজে এসেছিল। একটি অনাথ শিশুকে নিয়ে যাওয়ার সময় হালীমা প্রথমে খুশি ছিল না। কেননা তার ইচ্ছে ছিল এমন কোনও শিশুকে নিয়ে যাওয়ার যার পিতা জীবিত আছে, যেখানে বেশি পুরস্কার ও দান-দক্ষিণার আশা করা যেত। তাই সে প্রথমে আঁ হযরত (সা.)কে নিয়ে যেতে গড়িমসি করে, কিন্তু যখন আর কোনও শিশু পেল না আর তার সঙ্গের সকলে নিজেদের মত শিশু পেয়ে গেল, তখন সে খালি হাতে যাওয়ার থেকে আঁ হযরত (সা.)কে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল। কিন্তু অচিরেই সে জানত পারল তার নিয়ে আসা শিশুটি ছিল অসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী। সে বর্ণনা করে যে আঁ হযরত (সা.)-এ আগমণের পূর্বে আমরা চরম অভাব-অনটনের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু তাঁর আসার পর থেকে এই অভাব-অনটন স্বচ্ছলতায় পর্যবসিত হয়, আমাদের প্রতিটি বস্তুতে বরকত পরিলক্ষিত হয়। হালীমার সেই ছেলেটি যে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে দুধ পান করত তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার এক বড় বোনও ছিল যার নাম ছিল শীমা, যে আঁ হযরত (সা.)কে অনেক স্নেহ করত।

দুই বছর পর যখন লালন-পালনের সময়কাল পূর্ণ হল, তখন নিয়ম অনুসারে হালীমা আঁহযরত (সা.) কে মক্কায় নিয়ে আসে। কিন্তু সে আঁ হযরত (সা.)কে এত ভালবেসে ফেলেছিল যে, তার ইচ্ছে হচ্ছিল সম্ভব হলে তাঁর মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁকে পুনরায় নিয়ে যায়। তাই সে একটু জেদ করে বলল এখন শিশুটিকে আমার কাছে আরও কিছু সময় থাকতে দিন। আমি এর সব রকম যত্ন নিব। আমিনা প্রথমে অস্বীকার করে, কিন্তু পরে তার পীড়াপীড়ি দেখে এবং এই ভেবে যে মক্কার আবহাওয়ার থেকে বাইরের আবহাওয়া ভাল, আর যেহেতু সেই সময় মক্কার আবহাওয়া কিছুটা খারাপও ছিল, তাই তিনি হালীমার কথা মেনে নেন। হালীমা তাঁকে নিয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে যায়। এরপর প্রায় চার বছর বয়স পর্যন্ত তিনি (সা.) হালীমার কাছে ছিলেন এবং বনু সাআদ গোত্রের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করে বড় হন। এই

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"আপনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যগণ এম.টি.এ শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিন, আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণগুলি শুনুন।"

(২০১৬ সালের ঘানা জলসায় প্রদত্ত বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

গোত্রের ভাষা বিশেষ ভাবে শুদ্ধ এবং বাগ্মায়। আঁ হযরত (সা.)ও এই ভাষাই শিখেছিলেন।

হালীমা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আর গোত্রের সকলেই তাঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু তাঁর বয়স যখন চার বছর হল, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটল যা দেখে হালীম ভয় পেয়ে যায় আর তাঁকে মক্কায় এনে তাঁর মায়ের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনাটি ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর দুধভাই একসঙ্গে খেলছিলেন, তাদের সঙ্গে বড়দের মধ্য থেকে কেউ ছিল না। হঠাৎ করে শুভ্র পোশাক পরিহিত দুইজন মানুষ দেখা দেয়। তারা আঁ হযরত (সা.)কে ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় এবং বুক চিরে দেয়। এই দৃশ্য দেখে তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহ্ বিন হারিস সেখান থেকে দৌড়ে গিয়ে মাকে সংবাদ দেয় যে তার কুরাইশী ভাইকে দুইজন ব্যক্তি ধরে রেখেছে এবং তার বুক চিরছে। হালিমা এবং হারিস একথা শুনতেই দৌড়ে এসে দেখে সেখানে কোনও মানুষ ছিল না, কিন্তু আঁ হযরত (সা.) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর চেহারার রং পাল্টে যাচ্ছে। হালিমা এগিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা কি হয়েছে?' আঁ হযরত (সা.) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "তারা আমার বুকের মধ্যে কোনও বস্তুর সন্ধান করছিল, যেটি তারা বের করে ফেলে দিয়েছে। এরপর হারিস এবং হালিমা তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেলে হারিস হালিমাকে বলে, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই ছেলেকে কিছু হয়েছে। তাই তুমি যথাশীঘ্র ছেলেটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে এস।" কাজেই হালিমা তাঁকে মক্কায় এনে আমিনার হাতে তুলে দেয়। আমিনা শীঘ্র করার কারণ জোর করে জিজ্ঞাসা করলে হালিমা পুরো ঘটনা শোনায় এবং আশঙ্কা প্রকাশ করে যে ছেলের উপর হয়তো জিনের প্রভাব রয়েছে। আমিনা উত্তর দেন, 'এমনটি কখনই হতে পারে না। আমার ছেলে বড়ই গৌরবের অধিকারী। সে গর্ভাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমার মধ্য থেকে একটি জৌতি নির্গত হয়েছে যা দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে গিয়েছে।'

এই ঘটনার সমর্থন মুসলিমের একটি বিস্তারিত বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়, যেখানে আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার আঁ হযরত (সা.) কিছু ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, সেই সময় তাঁর জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে বুক চিরে ফেলেন এবং বুকের মধ্য থেকে হৃৎপিন্ড বের করেন এবং তার মধ্যে থেকে কোনও বস্তু বের করে ফেলে দিয়ে বলেন -'এটি ছিল দুর্বলতার কলুষতা যা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল।' এরপর জিবরাইল (আ.) তাঁর হৃৎপিণ্ডটি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় বুকের মধ্যে রেখে বুক একসঙ্গে জুড়ে দেন। অন্যান্য ছেলেরা যখন তাঁকে মাটিতে শুইয়ে বুক চিরতে দেখল, তখন তারা ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে তাঁর দাঈ মাকে বলল, "মহম্মদকে কেউ হত্যা করে ফেলেছে।" এরা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে পৌঁছলেন, তখন ফিরিশতা সেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল আর তিনি (সা.) সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সহী মুসলিমের সত্যায়নের পর ইবনে হিশাম-এর বর্ণনা এতটাই পোক্ত হয় যে কোনও বলিষ্ঠ দলিল ছাড়া সেটিকে আমরা দুর্বল রেওয়ায়েত বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তথাপি একথা স্পষ্ট যে এটি একটি দিব্য-দর্শন ছিল। তাই বক্ষদেশ ছেদনের বাহ্যিক চিহ্নাবলী অনুপস্থিত থাকা, অর্থাৎ সেই সময় ঘটনাস্থলে তাঁর দাঈমা এবং অন্যদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও বস্তু চোখে না পড়া প্রমাণ করে যে এটি একটি দিব্য-দর্শন ছিল যার আধ্যাত্মিক প্রভাব অন্যান্য শিশুরা পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল, যারা সেখানে উপস্থিত ছিল। যেমনটি এই দিব্য-দর্শনের মধ্যেই এর ব্যাখ্যা রয়েছে। এর অর্থ এই যে খোদার ফিরিশতা মানুষের রূপ ধারণ করে দিব্য-জগতে আঁ হযরত (সা.)-এর বক্ষ ছেদন করে সকল দুর্বলতার কলুষতা বের করে দেন। সহী হাদীস থেকে প্রমাণিত যে মেরাজের রাতেও আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে এই ধরণের বক্ষ ছেদনের ঘটনা প্রকাশ পায়, যেখানে ফিরিশতারা তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে যমযমের পরিষ্কার পানি ধুয়ে দেয় এবং পুনরায় যথাস্থানে রেখে দেয়।

এই স্থানে একথা উল্লেখ করাও অপ্রাসাঙ্গিক হবে না যে স্যর উইলিয়াম মিউর এই ঘটনার উল্লেখ করে কটাক্ষ করেছেন যে, নাউযুবিল্লাহ্ আঁ হযরত (সা.)-কে মৃগী রোগ আক্রমণ করেছিল। কারো মুখ বন্ধ রাখা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে মিউর সাহেব এমন আপত্তি করতে গিয়ে নিজেরই নিকৃষ্ট পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা একথা সর্বজনবিদিত যে মৃগীর রোগী দুর্বল মস্তিষ্কের হয়ে থাকে। অথচ মিউর সাহেব আঁ হযরত (সা.) প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করেছেন যে তিনি (সা.) উৎকৃষ্ট মানের শারিরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও যে বর্ণনার ভিত্তিতে এই আপত্তি করা হয়েছে তা নিজেই এই আপত্তির খণ্ডন করছে। কেননা বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে এই ঘটনা তাঁর দুধভাইও দেখেছিল আর সেই দৌড়ে গিয়ে তার মা-বাবাকে সংবাদ দিয়েছিল যে তার কুরায়েশী ভাইকে সাদা পোশাক পরা দুজন ব্যক্তি মাটিতে শুইয়ে বুক চিরে ফেলছে। পৃথিবীতে কি মৃগী এমনও আছে যার সম্পর্কে অন্যরাও এই ধরণের দৃশ্যের সাক্ষ্য দেয়? যে ব্যক্তির উপর রোগের আক্রমণ হয় সে এমন ধারণা করতেই পারে যে কেউ তাকে ধরে মাটিয়ে শুইয়ে দিয়েছে, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষদর্শীর চোখেও সেই একইদৃশ্য ধরা পড়া এমন উদ্ভট কথা যা এক বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মুখ থেকে বের হতে পারে না।

যাইহোক আঁ হযরত (সা.)-এর বয়স চার বছর হল, তখন হালীমা তাঁকে নিজের মায়ের সোপর্দ করে যায়। হালিমার এই চার বছরের লালন-পালন কোনও সাধারণ সেবা ছিল না, অপরদিকে আঁ হযরত (সা.) তুচ্ছাতিতুচ্ছ খিদমতকেও ভুলতেন না। তাই তো তিনি (সা.) আজীবন হালীমার এই সেবা মনে রেখেছেন এবং সব সময় তাঁর সঙ্গে অতি উন্নত আচরণ করেছেন। একবার দেশে অনাবৃষ্টির প্রকোপ দেখা দিলে হালীমা যখন মক্কায় আসে তখন তিনি তাকে চল্লিশটি ছাগল ও একটি উঁট দান করেন। নবুয়তের যুগে হালীমা একবার মক্কায় এলে আঁ হযরত (সা.) 'আমার মা, আমার মা' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান এবং তার বসার জন্য জন্য গায়ের চাদরখানি আসন হিসেবে পেতে দেন। অতঃপর একটি যুদ্ধে (হুনানের যুদ্ধে) হাওয়াযান গোত্রের হাজার হাজার বন্দী যখন তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি (সা.) সেই সম্পর্কের কারণেই সকলকে তিনি মুক্ত করে দেন, অথচ কারো কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে একটি কড়িও গ্রহণ করেন নি। এছাড়াও সেই বন্দীদের সঙ্গে আসা তাঁর এক দুধ-বোনকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার সহ ফেরত পাঠান। হালীমা এবং তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের মতে তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং মুসলমান থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর দুধ ভাই আব্দুল্লাহ্ এবং শীমাও মুসলমান থাকতেই মৃত্যু বরণ করে।

মায়ের অভিভাবকত্ব এবং ইয়াসরাব সফর

হালীমা যখন তাঁকে মায়ের কাছে ফেরত নিয়ে আসে, তখন তাঁর বয়স আনুমানিক চার বছর ছিল, যা তিনি মায়ের

ইমামের বাণী

"খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এম.টি.এ শোনা দরকার, এর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur, MSD.

অভিভাবকত্বেই থাকেন। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর হল তখন আমিনা নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইয়াসরাব যান এবং তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। উম্মে আইমানও সঙ্গে ছিল। এই সফরে আমিনার তাঁর মৃত স্বামীর সমাধিতে যাওয়ার ইচ্ছেও হয়তো ছিল। যাইহোক তিনি ইয়াসরাব যান এবং প্রায় একমাস সেখানে থাকেন। আঁ হযরত (সা.) এই দিনগুলি আজীবন মনে রেখেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তিনি (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় গেলেন, তখন তিনি সাহাবাদেরকে সেই বাড়িটি দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনি মায়ের সঙ্গে ছিলেন আর সেই জায়গাটিও দেখান যেখানে তিনি মদীনার ছেলেদের সঙ্গে খেলতেন আর সেই পুকুরটিও দেখান যেখানে তিনি সাঁতার অনুশীলন করতেন।

মায়ের মৃত্যু

প্রায় এক মাসকাল অবস্থানের পর আমিনা রওনা হলেন, কিন্তু নিয়তি স্বামীর মত প্রবাসেই তাঁর মৃত্যুও নির্ধারণ করে রেখেছিল। পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই সমাধিস্ত হন। নবুয়তের যুগে যখন তিনি (সা.) একবার এই স্থানটি অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি মায়ের কবরেও আসেন, আর তাঁর চোখ দুটিতে অশ্রু উথলে ওঠে। সাহাবারা এই দৃশ্য দেখে তাঁরাও কাঁদতে আরম্ভ করেন। আঁ হযরত (সা.) সাহাবাদের বলেন, 'আল্লাহ তা'লা আমাকে মায়ের কবর দেখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু দোয়া করার অনুমতি দেন নি।' এর দ্বারা এমনটি মনে করা উচিত নয় যে তাঁর মায়ের মাগফেরাত হবে না, কেননা এটি আল্লাহর হাতে। আর কেমন আচরণ করা হবে বা হবে না তা সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এর থেকে এতটুকু জানা যায়, যেমনটি আঁ হযরত (সা.) অন্য সময় বলেছেন, যে ব্যক্তি শিরক-এর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা উচিত নয়। বরং তার বিষয়টি খোদার হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

মায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই আঁ হযরত (সা.) মাত-পিতা উভয়কে হারিয়ে সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়লেন। স্বল্প বয়সে প্রবাসে আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে মাতৃ বিয়োগের বেদনা কোন সাধারণ বিষয় ছিল না, যখন কিনা ইতিপূর্বে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। এই বিষয়গুলি আঁ হযরত (সা.)এর মনে এক গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। নিঃসন্দেহে তিনি সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু বাহ্যিক কারণগুলির দিক থেকে এই বিষয়গুলিও তাঁর প্রকৃতিতে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর স্বভাবে যে অভাবপীড়িতদের প্রতি ভালবাসা এবং বিপদগ্রস্তদের প্রতি সহানুভুতি অন্যদের তুলনায় ভিন্ন মাত্রার ছিল, যার অনেকাংশই ছিল তাঁর প্রাথমিক জীবনের এই সব দুঃখ-দুর্দশার পরিণাম। কুরআন শরীফ আঁ হযরত (সা.)-এর অনাথ জীবনকে এই ভাষায় বর্ণনা করেছে-

اَلَمۡ یَجِدۡكَ یَتِیۡمًا فَاٰوٰی○وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰی○ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰی○
فَاَمَّا الۡیَتِیۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ○

"তিনি তোমাকে এতীম পান নাই এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নাই? এবং তিনি তোমাকে (তোমার জাতির প্রেমে) আত্মহারা পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে (তাহাদের সংশোধনের জন্য) হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্ত পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে সম্পদশালী করিয়াছেন। অতএব যে কোন এতীম হউক, তুমি তাহার সহিত কঠোরতা করিও না।

(সূরা যহা, আয়াত: ৭-১০)

আব্দুল মুত্তালিব-এর অভিভাবকত্ব

মায়ের মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) তাঁর পরিচারিকা উম্মে আইমানের সঙ্গে মক্কায় পৌঁছন। উম্মে আইমান নামে এই দাসীকেই তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তিনি একমাত্র উত্তররাধিকার বা সম্পদ হিসেবে পেয়েছিলেন, বড় হয়ে যাকে তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। পরে তাঁর মুক্ত দাস যায়েদ বিন হারিসার সঙ্গে উম্মে আইমানের বিবাহ হয়, যার গর্ভে উসামা বিন যায়েদের জন্ম হয়। উম্মে আইমান আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পরও জীবিত ছিল। যাইহোক মায়ের মৃত্যুর পর তিনি (সা.) উম্মে আইমানের সঙ্গে মক্কায় পৌঁছন। সেখানে পৌঁছনো মাত্রই আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে সরাসরি নিজ অভিভাবকত্বের আশ্রয়ে নেন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। খানা কাবার তোয়াফ করার সময় তাঁকে কাঁধে বসিয়ে নিতেন। আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর সঙ্গে অনেক স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। আব্দুল মোত্তালেবের রীতি ছিল কাবার আঙিনায় আসন পেতে বসতেন আর তাঁর সঙ্গে সেই আসনে বসার সাহস কারো হতো না। এমনকি আব্দুল মুত্তালিবের নিজের ছেলেরাও কিছুটা দূরে সরে বসতেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) ভালবাসার আবেগে সোজা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বসতেন এবং তিনিও তাঁকে দেখে খুশি হতেন। তাঁর চাচারা অনেক সময় তাঁকে আসনে বসতে বাধা দিলে আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, "তোমরা ওকে কিছু বলো না।"

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু।

এমন স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যেই আঁ হযরত (সা.)-এর দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, হঠাৎ করে আব্দুল মুত্তালিবও মারা গেলেন। তাঁর জানাযা এগিয়ে চলার সময় আঁ হযরত (সা.) সঙ্গে যাচ্ছিলেন আর তিনি অনবরত অশ্রুপাত করে চলেছিলেন। এটি ছিল তৃতীয় আঘাত যা তাকে শৈশবেই সহ্য করতে হয়েছিল। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল আট বছর। অন্যদিকে বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে আব্দুল মুত্তালিবের বয়স ছিল ৮০ থেকে ১৪০ বছর।

একাধিক স্ত্রীর গর্ভের আব্দুল মুত্তালিবের খ্যাতনামা পুত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল-হারিস, যুবের, আবু তালিব, আবু লাহাব, আব্দুল্লাহ, আব্বাস এবং হামযা। এদের মধ্যে আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ এক মায়ের সন্তান ছিলেন। সম্ভবত এই সম্পর্কের কারণেই আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুকালে আঁ হযরত (সা.)কে আবু তালিবের অভিভাকত্বে দিয়ে যান এবং তাঁর বিশেষ যত্ন নেওয়ার উপদেশ দেন। তাই এরপর থেকে আঁ হযরত (সা.) নিজের চাচা আবু তালিবের অভিভাকত্বে থাকতে লাগলেন। জাতিগত কাজের মধ্যে 'সিকায়া' এবং 'রিফাদা'-র কাজ যেটি আবু তালিবের দায়িত্বে ছিল, সেগুলি তিনি তাঁর জীবিত ছেলেদের মধ্য থেকে বড় ছেলে যুবেরের দায়িত্বে দেন। কিন্তু এই কাজ যেহেতু অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল, তাই যুবের নিজের সাধ্যের বাইরে দেখে দুটি কাজই আবু তালিবের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু আবু তালিব অভাবগ্রস্ত ছিল, সেই কারণে রিফাদার কাজ বনু নওফিলের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায় আর সিকাকার কাজটি আবু তালিব আব্বাসের হাতে তুলে দেন, যিনি তুলনামূলকভাবে ধনী ছিলেন।

এখানে একথা উল্লেখ করাও আবশ্যক যে আব্দুল মুত্তালিব জীবিত থাকতে বনু হাশিম অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ছিল, এমনকি তারা সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট পদমর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বনু হাশিমের মধ্য থেকে এমন কেউই এগিয়ে এল না যে এই সম্মান ও মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারত। এই কারণে কুরাইশদের প্রধান নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায় এবং বনু

ইমামের বাণী

" প্রকৃত ঈমান সেটিই যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার কর্মপন্থাকে নিজের রঙে রঙীন করে তোলে"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

হাশিমের প্রতিপক্ষ বনু উমাইয়া ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আবু তালিবের অভিভাবকত্ব

আবু তালিব তাঁর পিতার শেষ উপদেশ অত্যন্ত সততা এবং ন্যায়ের সাথে পালন করে। তিনি আঁ হযরত (সা.) কে তাঁর নিজের সন্তানদের থেকেও বেশি স্নেহ করতেন,সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখতেন এবং রাত্রিকালেও নিজের কাছে রাখতেন।

সিরিয়া ভ্রমণ এবং বুহাইরা নামক সাধুর ঘটনা

আঁ হযরত (সা.)-এর বয়স যখন বারো বছর, তখন আবু তালিবের একটি বাণিজ্যিক দলের সঙ্গে সিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন দেখা দেয়। যাত্রাপথ যেহেতু দীর্ঘ এবং দুর্গম ছিল, তাই তিনি আঁ হযরত (সা.)কে মক্কাতেই রেখে যাবেন বলে মনস্থির করেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে আবু তালিবের বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া প্রাণান্তকর কষ্টদায়ক ছিল। তাই তিনি ঠিক রওনার সময় প্রবল আবেগে আবু তালিবকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থা দেখে আবু তালিব নিজেও আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন এবং তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান।

সিরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে বুসরা নামক প্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে, যেখানে পৌঁছে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। সেখানে একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী থাকত যার নাম ছিল বুহাইরা। কুরাইশদের অভিযাত্রী দলটি যখন তার কুটিরের কাছে পৌঁছল, তখন সেই সন্ন্যাসী দেখল সমস্ত পাথর এবং বৃক্ষরাজি একত্রে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে। ঐশী গ্রন্থের আলোকে সে অবগত ছিল যে একজন নবীর আবির্ভাব আসন্ন। তাই সে নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করেছিল যে নিশ্চয় এই অভিযাত্রী দলের মধ্যেই সেই নবী বিদ্যমান। তাই সে আঁ হযরত (সা.) কে চিনতে সক্ষম হয়েছিল। সে আবু তালিবকে এ বিষয়ে অবগত করে এবং তাঁকে আহলে কিতাবের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার উপদেশ দেয়।

'ইলমে রিওয়াত'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত ঘটনাটির সনদ দুর্বল। কিন্তু যদি বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটেও থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এক্ষেত্রে বৃক্ষরাজির সিজদা করা, সন্ন্যাসীর দিব্য-দর্শন হিসেবে ধরা হবে, যা আঁ হযরত (সা.)-এর পদমর্যাদার নিরিখে কোন অসাধারণ বিষয় নয়।

আঁ হযরত (সা.)-এর মেষপাল তদারকি

আঁ হযরত (সা.) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে যথারীতি আবু তালিবের কাছেই থাকতেন, কিন্তু যেহেতু আরবের সাধারণ প্রথা, ছোটদেরকে তারা গৃহপালিত পশু ও মেষপাল চরানোর দায়িত্ব দিত, এই কারণে আঁ হযরত (সা.)ও কখনও কখনও মেষপাল চরানোর কাজ করেছেন। নবুয়তের যুগে তিনি বলতেন, মেষপাল চরানোর কাজও নবীগণের রীতি আর আমিও তা করেছি। একবার যখন কোনও এক সফরে তাঁর সাহাবারা জঙ্গলে ফল সংগ্রহ করে খাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, কালো ফলগুলি খাও। কেননা, আমি যখন মেষপাল চরাতাম তখন থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে কালো ফলগুলি বেশি উৎকৃষ্টমানের।

মন্দকর্ম থেকে ঐশী সুরক্ষা

এই দিনগুলির একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একরাতে আঁ হযরত (সা.) তাঁর এক মেষপালক সঙ্গীকে বলেন, তুমি আমার মেষপালটির দিকে লক্ষ্য রেখো, আমি একটু শহরে গিয়ে রাতের আসর দেখে আসি। সেকালের রীতি ছিল মানুষ কারো বাড়িতে একত্রিত হয়ে গল্প ও কবিতার আসর বসাত, অনেক সময় এতে সারা রাত্রি কেটে যেত। আঁ হযরত (সা.)ও বাল্যকালের উৎসুকতায় এই আসরের প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু এমন অনর্থক কাজে খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর অংশ গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ হয় নি। তাই একবার তিনি (সা.) এই উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু পথে তন্দ্রা এলে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন, আর এভাবে সকাল হয়ে যায়। পরে আরও একবার তিনি সেখানে যাওয়ার কথা চিন্তা করেন, কিন্তু অদৃশ্যের হাত এবারও তাঁকে আঁটকে দেয়। নবুয়তের যুগে আঁ হযরত (সা.) বলতেন, "আমি সারা জীবনে কেবল দুইবার এই ধরণের আসরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছিলাম, কিন্তু দুইবারই আমি বাধাপ্রাপ্ত হই।"
(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৯৩)

❖*❖****❖***

★ مَثَلُ الَّذِیْ یَذْکُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِیْ لَا یَذْکُرُهٗ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ ۔
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ مَثَلُ الْبَیْتِ الَّذِیْ یُذْکَرُ اللّٰهُ فِیْهِ وَالْبَیْتِ الَّذِیْ
لَا یُذْکَرُ اللّٰهُ فِیْهِ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

অনুবাদ: যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তাদের উপমা জীবিতদের ন্যায় আর যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না তাদের উপমা মৃতদের ন্যায়। অর্থাৎ যারা যিকর বা স্মরণ করে তারা জীবিত আর যারা করে না তারা মৃত। মুসলিম-এর রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- সেই গৃহ যেখানে খোদা তা'লার স্মরণ হয় আর সেই গৃহ যেখানে খোদা তা'লার স্মরণ হয় না, তাদের উপমা যথাক্রমে জীবিত ও মৃতদের ন্যায়।

(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত)

৩এর পাতায় পর.....

পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁরই (সা.)বিশেষত্ব। তিনি একটি বন্য স্বভাবের ও পশু প্রকৃতির জাতিকে মানবীয় অভ্যাস শিখিয়েছেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, পশুকে তিনি মানুষ বানিয়েছেন আর মানুষকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদা-প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার নিগুঢ় মন্ত্র ফুৎকার করেছেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। তাদেরকে খোদার পথে ছাগলের মত জবাই করা হয়েছে। তারা পিপীলিকার মত পদতলে পিষ্ট হয়েছেন; কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেননি, বরং সব বিপদের সময় সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার নিরিখে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং সত্যিকার আদম তিনিই ছিলেন যাঁর মাধ্যমে এবং যাঁর কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পুণ্য শক্তিসমূহ স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফুল-ফল শূন্য থাকে নি। নবুয়ত তাঁর সত্তাতে শুধু যুগের পরিসমাপ্তি কারণে শেষ হয় নি, বরং নবুয়তের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া তিনি যেহেতু ঐশী গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন তাই তাঁর শরীয়ত যুগপৎ জালালী ও জামালী (প্রতাপ ও সৌন্দর্যের) বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। তাঁর দুটি নাম মুহাম্মদ আহমদের (সা.)-এ পিছনে এটিই উদ্দেশ্য। তাঁর সার্বজনীন নবুয়তে কার্পণ্যের কোন দিক নেই; বরং সূচনা থেকেই তা বিশ্বজনীন।

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬)

*****❖*****❖*****❖*****

ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কখনও বিনষ্ট করেন না, যে কেবল তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য তিনি স্বয়ং অভিভাবক হয়ে ওঠেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

হুযুরের ভাষণের শেষাংশ ৭ পৃ-র পর......

আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে আমাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার মান কোন পর্যায়ে আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের উদাহরণ দেখা উচিত। নিজেদের পারিবারিক জীবনেও এর দৃষ্টান্ত দেখুন যে আপনি কি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। আঁ হযরত (সা.) পারিবারিক জীবনেও প্রতিশ্রুতির রক্ষার বিষয়ে বলেছেন যে কিয়ামত দিবসে এই বিষয়টি সব থেকে বড় বিশ্বাসভঙ্গের সামিল হবে যে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরও স্ত্রীর গোপন রহস্যগুলি মানুষের কাছে বলে বেড়ায়। (সহী মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ)

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু মানুষ এই গর্হিত কাজ করে থাকে। যারপরনায় জঘন্য এবং ন্যক্কারজনক কাজ তারা করে থাকে। আর কেবল মৌখিকভাবেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং মানুষকে হোয়াটসএপ এবং অন্যান্য মাধ্যম যেমন ম্যাসেঞ্জার ও টুইটারের মাধ্যমে এই কথাগুলি ছড়িয়ে বেড়ায়। এরা নিঃসন্দেহে সব থেকে বড় বিশ্বাসঘাতক। আল্লাহ্ তা'লা এটি নিষেধ করেছেন। যদি বিবাহ বিচ্ছেদও হয়ে থাকে, তবু অন্যের গোপন কথা ফাঁস করার অধিকার কারো থাকতে পারে না। এটি অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা যা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির মধ্যে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

তাই এমন মানুষদের নিজেদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে বলেন-

"কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, মনকে সকল প্রকার মলিনতা হতে নির্মূল করেন এবং আপন খোদার সাথে সর্বদা বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! কারণ, তাঁরা কখনও বিনষ্ট হবেন না। খোদা কখনও তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না, যেহেতু তাঁরা খোদার এবং খোদা তাঁদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁদেরকে রক্ষা করা হবে।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৯-২০)

তাই যদি খোদা তা'লার সঙ্গে একনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয় তবে তাঁর বিধিনিষেধগুলিও পালন করা হবে এবং পারিবারিক চুক্তি থেকে বাইরে সামাজিক চুক্তি পালন করা হবে এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন রক্ষার সময়ও এবিষয়টি কঠোরভাবে মেনে চলা হবে। ব্যবসা-বানিজ্যের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেও নিয়মনিষ্ঠতা থাকবে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে সকল প্রকারের চুক্তির প্রতি দায়বদ্ধ থাকলে এমন লোকেরা যাবতীয় প্রকারের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে, কেননা খোদা তা'লার নির্দেশের কারণে আমরা চুক্তি মেনে চলছি, আর এটিই একজন প্রকৃত আহমদীর ও প্রকৃত মুসলমানের কর্মপন্থা হওয়া কাম্য।

এরপর রয়েছে বিনয় যা এক বিরাট নৈতিক বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা, যাহারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হইয়া চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া) বলে, 'সালাম'। (ফুরকান: ৬৪)

এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ কি ছিল? হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে আমি আঁ হযরত (সা.)কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার খুব বেশি প্রশংসা করো না যেভাবে খৃষ্টানরা মরিয়ম পুত্র ঈসার করে থাকে। আমি কেবল আল্লাহ্‌র এক বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে কেবল আল্লাহর বান্দা এবং রসুল বলেই সম্বোধন কর।

(সহী বুখারী, কিতাবু আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৪৪৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন- " আমাদের নবী করীম (সা.)-এর থেকে উত্তম পৃথিবীতে কোনও পূর্ণ মানবের দৃষ্টান্ত না আছে, আর না ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হতে পারে। অতঃপর দেখ নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার পরও হুযুর (সা.) اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আল কাহাফ: ১১১) বার বার একথাই বলতে থাকেন, এমনকি 'কলেমায়ে তওহীদ'এ নিজের বান্দেগী স্বীকার করাকে অনিবার্য করা হয়েছে, যেটি ব্যতিরেকে কেউ মুসলমান হিসেবেই গণ্য হতে পারে না। চিন্তা কর! পুনরায় চিন্তা করে দেখ! যেরূপে পরিপূর্ণ পথ-প্রদর্শক এর জীবনযাপন পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে– নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেও যিনি বান্দেগী স্বীকার করাকে হাতছাড়া করেন নি, সেক্ষেত্রে অন্য কারোর জন্য এমন ভাবনাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়াই বৃথা।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৭-১১৮)

আঁ হযরত (সা.) একবার বলেন," তোমরা আমার কাছে নিজেদের ঝগড়া নিয়ে আস। কিন্তু আমিও তো মানুষ- হতেই পারে যে তোমাদের মধ্যে একপক্ষ নিজের দলিল উপস্থাপনে অপরপক্ষের থেকে দক্ষ। তাই আমি যা শুনব, সেই অনুসারে তার পক্ষেই রায় দিব যে বেশি বাগ্মী, বেশি দলিল উপস্থাপনকারী। অতএব, যাকে আমি তার ভাইয়ের অধিকার থেকে তার সেই সব দলিলের কারণে কিছু দিই, অথচ সেটি তার অধিকার নয়, অধিকার তার ভাইয়ের। তাই আমি যদি তার ভাইয়ের অধিকার থেকে তাকে কিছু দিই তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও তা না নেওয়াই হল সততার দাবি। কেননা, এমতাবস্থায় আমি যেন তাকে আগুনের টুকরো কেটে দিলাম।

(সহী বুখারী, কিতাবুশ শাহাদত, হাদীস-২৬৮০)

নিজের পক্ষে রায় ঘোষিত হলেও সেটি হবে আগুনের টুকরো। সেই আগুনের টুকরো গ্রহণ না করে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া শ্রেয়। তাকে পরিস্কার বলে দাও, 'এটি আমার প্রাপ্য নয়, অপর পক্ষের প্রাপ্য।'

তাই যারা অন্যায্য সিদ্ধান্ত করানো চেষ্টা করে, তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ। সাংসারিক জীবনেও আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় এবং পরিবারের সদস্যদেরকে সাহায্য করার বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "রসুল করীম (সা.) পরিবারের লোকদেরকে সংসারের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি (সা.) কাপড় নিজে ধুতেন এবং ঘরে ঝাঁটও দিতেন। নিজেই উট বাঁধতেন, জলবাহক পোষ্যদের খেতে দিতেন, ছাগলের দুধ দুইতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজ নিজেই করতেন। ভৃত্যদেরকে কোনও কাজের নির্দেশ দিলে সে কাজে নিজেও সাহায্য করতেন, এমনকি তার সঙ্গে মিলে আটাও প্রস্তত করতেন এবং বাজার থেকে মালপত্র নিজে বয়ে আনতেন।

(আশশিফা বিতারিফি হুকুকুল মুস্তাফা, পৃ: ১৭৬, হাদীস-২৭১,২৭২,২৭৩)

বর্তমান যুগে বাড়িতে কিছু পুরুষ অহংকার দেখায়। সময়মত কাপড় পরিস্কার করা না পেলে কলহ বেঁধে যায়, যদিও এখন তো হাতে ধোয়া হয় না, ওয়াশিং মেশিন রয়েছে, নিজেরাও ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিতে পারে, কিন্তু তবু এই কষ্টটুকুও করবে না। ঝাড়ু দেওয়ার চল এখন তো আর নেই, সর্বত্র হুভার ব্যবহৃত হচ্ছে, যা অনায়াসে চালানো যায়। কিন্তু তাতেও ভণিতা দেখানো হয়, যার কারণে সংসারে অশান্তি হয়ে থাকে। তাই আহমদী হয়ে আমাদেরকে নিজেদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত।

এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের বাইরের জীবন লক্ষ্য করলে দেখব যে তাঁর উচ্চমানের নমুনাগুলি এক একটি দৃষ্টান্ত। সেগুলির উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ(আ.)বলেন- "অহংকারী খোদার আসনে বসতে চায়। এই গর্হিত স্বভাব থেকে সব সময় (খোদার) আশ্রয় চাও। যদি খোদা তা'লার সকল প্রতিশ্রুতিও তোমার সঙ্গে থাকে, তবু তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। কেননা বিনয় অবলম্বনকারীই খোদার প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে। দেখ, আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সফলতা যদিও এমন ছিল যে পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে যার তুলনা পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা যত সফলতা দান করেছেন, তিনি ততই বিনয় অবলম্বন করতে থেকেছেন।

একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর সামনে ধরে আনা হয়। তিনি দেখলেন, সেই ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবলভাবে কেঁপে চলেছে। সে কাছে এলে আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত বিনম্রভাবে বললেন, 'তুমি এমন ভয় পাচ্ছ কেন? আমিও তোমার মত একজন মানুষ, এক বৃদ্ধার সন্তান।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

একস্থানে আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় ও নিরহঙ্কারতার উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "কেবল আস্ফালন, অযথা অহকংকার ও বড়াই করা থেকে বিরত থাকা উচিত, বিনয় অবলম্বন করা উচিত। দেখ, প্রকৃতপক্ষে সব থেকে বেশি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয়ের একটি দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে বিদ্যমান। বর্ণিত হয়েছে যে এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে কুরআন শরীফ পড়ত। একদিন আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে মক্কার প্রমুখ নেতা ও সর্দাররা এসে উপস্থিত হয়। তাই তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কথা বলতে গিয়ে ব্যস্ততার কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা দেখে সেই দৃষ্টিহীন ব্যক্তিটি সেখান থেকে চলে যায়। এটি একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে সূরা নাযেল করেন। এরপর আঁ হযরত (সা.) সেই ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং নিজের চাদর পেতে বসতে দেন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আসল কথা হল যাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার মহত্ব থাকে তাদেরকে বিনয়ী হতেই হয়। কেননা তাঁরা খোদাতা'লা মুখাপেক্ষীহীনতা সম্পর্কে সব সময় ভীত থাকে।

'আনাঁকিহ আরিফ তার আন্দ তরসাঁ তার"

অর্থাৎ জ্ঞানীরা বেশি ভয় করে।

"কেননা যেভাবে আল্লাহ তা'লা তুচ্ছ কর্মেরও প্রতিদান দিয়ে থাকেন, অনুরূপভাবে (আপাত) তুচ্ছ কারণে ধৃতও করেন। যদি কোনও কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে নিমেষেই যাবতীয় ক্রীয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এই কথাগুলি প্রণিধান কর, স্মরণ রাখ এবং মেনে চল। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৩-৩৪৪)

আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে যে উপদেশবাণী দিয়েছেন, অবশ্যই তা পালনীয়। অবশ্যই তাঁর উপদেশাবলী আমাদেরকে নিজেদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন করে তোলা উচিত। আঁ হযরত (সা.) একস্থানে বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউই নিজের কর্মের দরুণ নাজাত বা মুক্তিলাভ করবে না।" সাহাবাগণ বললেন, "হে রসুলুল্লাহ্! আপনিও?" আঁ হযরত (সা.) বললেন, "হ্যাঁ, আমিও নিজের কর্মের প্রতিদানে নাজাত লাভ করব না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বীয় কৃপা-ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাই তোমরা সরল পথ অবলম্বন কর, শরীয়তের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট থাক, সকাল,সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে ইবাদত কর এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। ইবাদত কর এবং মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৫৩, হাদীস-১০৬৮৮)

মধ্যমপন্থা প্রতিটি বিষয়ে আবশ্যক। জাগতিকতায় মত্ত হয়ে যেও না। আল্লাহ্ তা'লা জাগতিকতার বৈধ অধিকার দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাতেও মধ্যমপন্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। খোদাকে যেন ভুলে যাওয়া না হয়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করতে হবে, সেখানে সেদিকে মনোযোগ দাও। যে কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি দাও, যতটুকু করার দরকার তা করার চেষ্টা কর। কিন্তু জাগতিকতা খোদার অধিকারের মূল্যে হওয়া উচিত নয়। ধর্ম যেন সবসময় জাগতিকতার উপর অগ্রাধিকার পায়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এমনটি হলে তবেই তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপালাভ করবে।

কাজেই এর দ্বারা একদিকে যেমন আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তেমনি অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে তাঁর ভয়ও ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন, আমারই যখন এমন অবস্থা, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার এবং তাঁর কৃপা প্রার্থনা করার বিষয়ে কি পরিমাণ উদ্বিগ্ন থাকতে হবে।! একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও করুণাই তাঁর পুরস্কারের অংশীদার বানায়। আমরা কোন্ উপায়ে তাঁর দরবারে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাব তা আদৌ জানি না। কাজেই এই কৃপা ও করুণা লাভের জন্য নিজেদের ইবাদত এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্রের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

বাহ্যিক অবস্থা এবং মানুষের মুখের প্রভাবও তার চরিত্রকে প্রতিবিম্বিত করে। এ সম্পর্কে সাহাবাগণ আঁ হযরত (সা.)-এর সম্পর্কে কিরূপ বর্ণনা করেছেন তা হযরত বারাআ বিন গারিব (রা.)-বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, "রসুলুল্লাহ (সা.) সকলের চেয়ে বেশি সৌন্দর্য এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৫৪৯)

সুন্দর চেহারা হলে মানুষের মধ্যে অহংকার জন্ম নেয়। আঁ হযরত (সা.) দোয়া করতেন, "হে খোদা! যেভাবে তুমি আমাকে সুন্দর চেহারার অধিকারী করেছ, অনুরূপভাবে সুন্দর চরিত্রের অধিকারীও করে তোল।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৮৮)

এই ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনের কয়েকটি দিক যা বর্ণনা করা হল। এর থেকে তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্য সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁর বিনয় এমন মাত্রার ছিল যে তিনি খোদা তা'লার নিকট দোয়া করছেন , " আমার চরিত্র, আচরণ এবং ইবাদতের মান যেন এমন হয় যা তুমি এবং তোমার সৃষ্টিকুলের কাছে পছন্দনীয় হয়।

আরও একজন সাহাবী সাক্ষ্য প্রদান করেন, "আমি আঁ হযরত (সা.)-এর থেকে বেশি হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর কারো দেখি নি।"

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৪১)

উম্মে মাআবাদ আঁ হযরত (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন, "দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হওয়া লোকদের মাঝে আঁ হযরত (সা.) সব থেকে সুদর্শন ছিলেন আর কাছে থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী।"

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০-১১)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, "তিনি সকলের চেয়ে প্রশস্ত বক্ষদেশের অধিকারী ছিলেন। কথা বলার সময় সব থেকে বেশি সত্যবাদি এবং সব থেকে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। সামাজিকতা এবং সৌজন্য প্রদর্শনে সব থেকে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন ।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৩৮)

তাঁর আদর্শ ও নৈতিকতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁর চরিত্রের যে কোনও একটি দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেটিতেই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। আর তাঁর এই আদর্শ অনুসরণের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজে আমরা যদি পৃথিবীকে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর স্বরূপ দেখাতে চাই, তবে তাঁর আদর্শের প্রতিটি আঙ্গিককে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা তা তুলে ধরতে হবে। এতেই আমাদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ করার স্বার্থকতা, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর ধর্মের প্রসারের জন্য প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চারিত্রিক দিকটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "কুরআন করীমে আঁ হযরত (সা.)-এর যে অতীব উন্নত নৈতিকতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তা হযরত মূসা (আ.)-এর থেকে সহস্রগুণ শ্রেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হযরত খাতামুলআম্বিয়া (সা.) হলেন সেই সকল উন্নত নৈতিকতার সমষ্টি যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে বিদ্যমান। তাঁর সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। (৬৮: ৫)। আরবী বাগধারায় 'আজিম' শব্দটি যখন কোন কিছু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন বুঝতে হবে, সেই বিষয় বা বস্তু স্বীয় পূর্ণতার চরমত্বে পৌঁছে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বলা হয়, এই বৃক্ষটি 'আজিম' বৃক্ষ,

তাহলে তার অর্থ হবে, একটা বৃক্ষের উচ্চতা ও প্রসারতা যতটা হওয়া সম্ভব তা সবই ঐ বৃক্ষটির আছে। অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত আয়াতের অর্থ হল, উন্নত নৈতিকতা ও গুণাবলী যে সীমা পর্যন্ত মানুষ অর্জন করতে পারে, সেই নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা মহম্মদ (সা.)-এর মাঝে বিদ্যমান। এই প্রশংসা এমনই উচ্চাঙ্গের যার অধিক বর্ণনা সম্ভব নয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০৬, উপটীকা নং-৩)

তিনি আরও বলেন,

"সেই মানুষ যিনি তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর কাজে কর্মে, তাঁর নিরন্তন তৎপরতায় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও পবিত্র মানসিক ক্ষমতা সমূহের মাধ্যমে- জ্ঞানে, সাধুতায় ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন এবং ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন---- সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী এবং যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া ইমামুল আসফিয়া খাতামুল মুরসালীন ফখরুন্নাবীঈন জনাবে মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হে আমাদের খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ কর নি। যদি এই আজিমুশশান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.) মালাকী (আ.), ইয়াহইয়া (আ.), জাকারিয়া (আ.) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই থাকত না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সা.) কৃপা ও অনুগ্রহ যার দরুন এঁরা সকলেই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔"
(اتمام الحجۃ، روحانی خزائن، جلد 8، صفحہ 308)

(ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন সঠিক অর্থে এই পরিপূর্ণ নবীর উম্মত হই এবং সেই সৌন্দর্য ও দীপ্তিময় চেহারা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে পৃথিবী অন্ধকার দূরীভূত করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন। এখন দোয়া করুন।

সৌজন্যে: আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ই আগস্ট, ২০১৯)

১ম পাতার শেষাংশ... ** *❖*****❖*****❖* ***

বললাম, "হুযুর! আমার নতুন বিয়ে হয়েছে, অতএব আমাকে মদিনায় যাওয়ার অনুমতি দিন।" হুযুর (সা.) অনুমতি দিলেন আর আমি অন্যদের থেকে আগেই বাড়ি পৌঁছে যাই। রাস্তায় আমার মামার সঙ্গে দেখা হলে তিনি উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই শীর্ণকায় উটটি এখন কি করে এমন দ্রুত হাটছে। আমি সমস্ত বৃতান্ত বর্ণনা করলে মামা আমাকে তিরস্কার করেন।

হুযুর (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইতে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি যুবতীকে বিয়ে করেছ নাকি কোন বিধবা মহিলাকে।" আমি উত্তর দিলাম, 'বিধবা মহিলাকে।' একথা শুনে হুযুর (সা.) বললেন, 'কোন যুবতী মেয়েকে তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল; সে তোমার সঙ্গে খেলত, আর তুমি তার সঙ্গে খেলতে।' আমি বললাম, 'হুযুর! আমার পিতা শহীদ হয়ে গেছেন, আর আমার অনেকগুলি ছোট ছোট বোন আছে। তাই আমি চাইলাম না তাদের মতই বউ ঘরে নিয়ে আসি, আর তাদের দেখাশোনার জন্য কেউ না থাকুক। হুযুর যখন মদিনা এলেন, আমি সকাল সকাল উট নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। হুযুর আমাকে উটের দামও দিলেন আরও উটটিও (উপহারস্বরূপ) দিয়ে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩৫৭)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আঁ হযরত (সা.)-এর চেহারায় দুর্বলতা ও ক্লান্তির লক্ষণ দেখে তাঁর কাছে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চান। বাড়ি এসে স্ত্রীকে বললেন, "আঁ হযরত (সা.) ক্ষুধার কারণে চরম কষ্টে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তোমার কাছে কি কিছু খাবার আছে? সে উত্তর দিল, " কিছু পরিমাণ যবের আটা আছে আর একটি ছাগল আছে। জাবের বলেন, 'একথা শুনে আমি ছাগলটি জবাই করলাম এবং আটা প্রস্তুত করে স্ত্রীকে বললাম, 'তুমি খাবার তৈরী কর। আমি গিয়ে তাঁকে আসতে বলি।" আমার স্ত্রী বলল, 'আমাকে যেন অপদস্ত করো না, খাবার অল্প আছে তা মাথায় রেখো। রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যেন অনেক লোক চলে না আসে।" জাবের বলেন, " আমি আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম, 'হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমার কাছে কিছু মাংস আর কিছু যবের আটা আছে, যেগুলি আমার স্ত্রীকে আমি রান্না করতে বলে এসেছি। আপনি কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আহার করুন।" আঁ হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন যে খাবার কতটা পরিমাণ রয়েছে। আমি বললাম এতটা পরিমাণ রয়েছে। তিনি বলেন, 'যথেষ্ট'। অতঃপর তিনি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে উচ্চস্বরে বললেন, ' হে আনসার ও মুহাজিরদের দল! চল, জাবের আমাদের খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। সেই আহ্বান শুনে প্রায় একহাজার ক্ষুধাতর সাহাবী তাঁর সঙ্গ নিলেন। আঁ হযরত (সা.) জাবেরকে বললেন, "শীঘ্র গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না আসি চুলো থেকে হাঁড়ি যেন না নামায় আর রুটি তৈরী করতে শুরু না করে দেয়।" জাবের দ্রুত গিয়ে স্ত্রীকে সংবাদ দেন, যে কিনা এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে খাবার তো মাত্র কয়েকজনের মত রয়েছে, আর তারা এতগুলো লোক আসছেন। এখন কি হবে!" আঁ হযরত (সা.) তাঁর বাড়িতে পৌঁছেই প্রশান্ত চিত্তে হাঁড়ি এবং আটার পাত্রের উপর দোয়ার করে বলেন, 'এখন রুটি তৈরী করতে শুরু কর।' অতঃপর তিনি ধীর গতিতে খাদ্য পরিবেশন করতে আরম্ভ করেন। জাবের বর্ণনা করেন,'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, এই খাবারেই সকলে আহার করে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠল, অথচ হাঁড়িতে মাংস ঠিক তেমনভাবেই ফুটছিল আর আটা থেকে রুটি তৈরীও অব্যাহত ছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচন-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- পৃ: ৫৭৮)

আঁ হযরত (সা.)-এর এক সাহাবী ছিলেন হযরত নোয়ায়মান বিন আমার। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত নোয়ায়মান বদর, উহুদ, পরিখা এবং অন্য সকল যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, নোয়ায়মান-এর জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কিছু বলো না, কেননা সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে ভালোবাসে।

হযরত নোমান সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, তার স্বভাবে রসিকতা ছিল। রাবীআ বিন উসমান হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সকাশে জনৈক বেদুঈন আসে এবং মসজিদে প্রবেশ করে নিজের উটকে মসজিদ-প্রাঙ্গণে বসিয়ে দেয়। এতে কতিপয় সাহাবী হযরত নোমানকে বলেন, তুমি যদি এই উটটিকে জবাই করতে পার তাহলে আমরা এর মাংস খেতে পারি কেননা মাংস খেতে আমাদের খুবই ইচ্ছে করছে। এটি যেহেতু বেদুঈনের উট, তাই মহানবী (সা.)-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হবে আর তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথায় প্ররোচিত হয়ে হযরত নোমান এসে সেই উট জবাই করে ফেলেন আর সেই বেদুঈন মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ বাহনের এই অবস্থা দেখে হৈচৈ শুরু করে আর বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার উটকে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ কাজ কে করেছে? মানুষ বলে, নোমান করেছে। একাজ করার পর নোমান সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ছিলেন; যাহোক মহানবী (সা.) তার সন্ধানে বের হন। তিনি হযরত যুবাব বিনতে যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে লুকানো অবস্থায় পান। যেখানে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, জনৈক ব্যক্তি সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উচ্চস্বরে

বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমি তো তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। যাহোক তিনি (সা.) তাকে সেখান থেকে বের করে বলেন, তুমি এমন কাজ কেন করেছ? নোমান নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছে যে, আমি এই উট জবাই করেছি তারাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল, তারাই আমাকে বলেছিল আর এটিও বলেছিল যে, মহানবী (সা.) পরবর্তীতে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবেন, অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) একথা শুনে নোমানের চেহারাকে নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করেন এবং মুচকি হাসতে থাকেন। আর তিনি (সা.) উক্ত বেদুঈনকে তার উটের মূল্য পরিশোধ করে দেন।

"মদিনায় যখনই কোন ফেরিওয়ালা প্রবেশ করতো হযরত নোমান তার কাছ থেকে কিছু না কিছু ক্রয় করতেন, অর্থাৎ বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা কোন জিনিস নিয়ে আসলে হযরত নোমান তাদের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর জন্য কিছু একটা ক্রয় করতেন, আর সেটা নিয়ে মহানবী (সা.) উপস্থিত হয়ে নিবেদন করতেন যে, আপনার জন্য এটি আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকন। সেই জিনিসের মালিক যখন হযরত নোমানের কাছ থেকে উক্ত জিনিসের মূল্য গ্রহণের জন্য আসত, যিনি সেখানে ঘোরাঘুরি করতেন আর (জিনিস ক্রয়ের সময়) বলে দিতেন যে, আমি অমুক জায়গায় থাকি, পরে মূল্য নিয়ে নিও, তারা তাকে চিনতও। যাহোক, বিক্রেতা যখন মূল্য নিতে আসত তখন তিনি তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যেতেন আর নিবেদন করতেন যে, তাকে তার জিনিসের মূল্য পরিশোধ করে দিন। অর্থাৎ আমি যে অমুক জিনিসটি ক্রয় করে আপনাকে দিয়েছিলাম আপনি এর মূল্য পরিশোধ করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলতেন যে, তুমি কি অমুক জিনিস আমাকে উপঢৌকনস্বরূপ দাও নি? তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, উক্ত জিনিসের মূল্য পরিশোধের জন্য আমার কাছে কোন অর্থ-কড়ি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি তা খাবারের জিনিস হয় তা আপনি আহার করুন, যদি রাখার জিনিস হয় তবে আপনি যেন তা রেখে দিন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হাসতে থাকতেন আর সেই জিনিসের মালিক'কে এর মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য আদেশ দিতেন।"

[হযরত খলীলফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) প্রদত্ত খুতবা জুমা, ৩০ শে মার্চ, ২০১৮]

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যদিও নিজ সঙ্গী-সাথি নিয়ে এই বাহিনীর সাথে রওয়ানা হয় কিন্তু উহুদের পাদদেশে পৌঁছে তার তিনশ' সঙ্গীসাথিকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করে মদিনা অভিমুখে ফিরে যায়, ফলে মুসলমান সৈন্য সংখ্যা কেবল ৭০০ বাকি থেকে যায়।

৫হিজরী সনে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে কোন ভুল বোঝাবুঝির কারণে লড়াই হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর অসাধারণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং উভয় পক্ষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে এমনটি হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে বলে বসে- لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (সূরা মুনাফিকূন: ০৯) পবিত্র কুরআনের সূরা মুনাফিকূন-এ উক্ত আয়াতের উল্লেখ আছে যার অর্থ হলো, তোমরা দেখো, এখন মদিনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তি বা দল লাঞ্ছিত ব্যক্তি বা দলকে শহর থেকে বের করে দেয় কিনা? কিছুক্ষণ পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু সুলুল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবদেন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি শুনেছি আপনি আমার পিতার ঔদ্ধত্য ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে চান। আপনার সিদ্ধান্ত যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, আমি এখনই আমার পিতার শিরোচ্ছেদ করে আপনার পদতলে রেখে দিব, কিন্তু দয়া করে আপনি অন্য কাউকে এ নির্দেশ দিবেন না। কেননা আমার আশংকা হয় যে, আমার মাঝে অজ্ঞতার যুগের মানসিকতা মাথাচাড়া দেবে আর আমি আমার পিতার হত্যাকারীর কোন ক্ষতি করে বসব এবং খোদার সন্তুষ্টির সন্ধান থাকা সত্ত্বেও দোযখে নিপতিত হব। আমি আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চাই কিন্তু একজন মুসলমানকে হত্যা করে আমি দোযখে চলে যাব। মহানবী (সা.) তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমার ইচ্ছা আদৌ এটি নয় বরং সর্বাবস্থায় আমি তোমার পিতার সাথে নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করব। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.) মুনাফিক সর্দারের পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে কিরূপ স্নেহ ও ভালবাসাপূণ আচরণ করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যখন মারা যায় তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হুযূর! আপনি আপনার একটি জামা দিন, যেন আমি সেটিকে আমার পিতার কাফন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আর আপনি তার জানাযার নামায পড়ান এবং তার জন্য ইস্তেগফার করুন। তখন মহানবী (সা.) তাকে নিজের একটি জামা প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা যখন দাফন-কাফন এর প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে তখন আমাকে ডাকবে। মহানবী (সা.) যখন জানাযার নামায পড়াবার উপক্রম করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মুনাফেকদের জানাযার নামায পড়াতে নিষেধ করেছেন।' মহানবী (সা.) বলেন, 'আমাকে তাদের জন্য ইস্তেগফার করা বা না করার বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।' সুতরাং মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা এ ধরনের ব্যক্তিদের জানাযার নামায না পড়ানোর ব্যাপারে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তখন থেকে মহানবী (সা.) মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

আবি বিন সুলুলের প্রতি আঁ হযরত (সা.)-এর যে আচরণ ছিল তার মূল কারণ ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুলুলের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা। অথচ হাদীসে অন্য কারণ বর্ণিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, " আমার ধারণা মতে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র কারণে মহানবী (সা.) এমন সদয় আচরণ করেছিলেন, কেননা তার পুত্র প্রতিটি বিষয়ে ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর জন্য আত্মাভিমান দেখিয়েছেন এবং নিজের ঈমানের সুরক্ষা করেছেন, এমনকি নিজ পিতার প্রতি কঠোরতাও করেছেন। এ কারণে সন্তানের মনস্তুষ্টির জন্য বা তার বাসনার কারণে তিনি (সা.) নিজ পোশাক খুলে দিয়েছিলেন।

[হযরত খলীলফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) প্রদত্ত খুতবা জুমা, ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই 'তওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ব) যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপর উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাংখিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১১৮)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

(মনসুর আহমদ মসরূর)

দোয়াপ্রার্থী:
Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour.

মুহাম্মদ (সা.)-এর পদধূলিতে আমার মস্তক উৎসর্গিত,
আর আমার হৃদয় সর্বক্ষণ মহম্মদে (সা.) বিলীন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম

عجب لعلیست در کانِ محمدؐ আশ্চর্য আলো রয়েছে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণে,	عجب نوریست در جانِ محمدؐ আশ্চর্য ও বিস্ময়কর মুক্তোর দ্যুতি তাঁর (সা.) কানে।
که رُو تابند از خوانِ محمدؐ আমি ঐ সকল অর্বাচীনের জন্য বিস্ময়বোধ করি,	عجب دارم دل آں ناکساں را যারা মুহাম্মদ-এর দস্তরখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
که دارد شوکت و شانِ محمدؐ আমি দু' জাহানের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি দেখি না	ندانم ہیچ نفسے در دو عالم যে কিনা মুহাম্মদ-এর ন্যায় গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী।
که باشد از عدوّانِ محمدؐ খোদা তা'লা সেই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত কীটকে পুড়িয়ে ফেলেন	خُدا خود سوزد آں کِرمِ دنی را যে মুহাম্মদ (সা.)-এর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত।
بیا در ذیلِ مستانِ محمدؐ যদি তুমি কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও,	اگر خواہی نجات از مستیٔ نفس তাহলে মুহাম্মদ-এর প্রেমের মাস্তানদের আলখিল্লায় প্রবেশ কর।
بشو از دل ثنا خوانِ محمدؐ যদি তুমি চাও খোদা তোমার প্রশংশা করুক, তবে	اگر خواہی کہ حق گوید ثنایت আন্তরিকভাবে মহম্মদ (সা.)-এর প্রশংস হয়ে ওঠ।
دلم ہر وقت قربانِ محمدؐ মুহাম্মদ (সা.)-এর পদধূলিতে আমার মস্তক উৎসর্গিত,	سرے دارم فدائے خاکِ احمدؐ আর আমার হৃদয় সর্বক্ষণ মহম্মদে (সা.) বিলীন।
محمدؐ ہست برہانِ محمدؐ যদি তুমি তাঁর সত্যতার প্রমাণ চাও, তবে তাঁর প্রেমিক হও	اگر خواہی دلیلے عاشقش باش কেননা মুহাম্মদ স্বয়ংই মুহাম্মদের প্রমাণ।
که خواندم در دبستانِ محمدؐ আমি অন্য কোন উস্তাদের নাম জানি না, কেননা	دگر اُستاد را نامے ندانم আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর মাদ্রাসায় পড়েছি।
بترس از تیغ بُرّانِ محمدؐ হে অর্বাচীন ও পথভ্রান্ত শত্রুরা! হোশিয়ার হয়ে যাও,	اَلا اے دشمنِ نادان و بے راہ মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্তনকারী তরবারির ভয়ে ভীত হয়ে যাও।
ہم از نورِ نمایانِ محمدؐ হোশিয়ার হয়ে যাও।	اَلا اے منکر از شانِ محمدؐ হে মুহাম্মদ (সা.)-এর মহিমা ও তাঁর প্রকাশিত আলোকের অস্বীকারকারী!
بیا بنگر زِ غلمانِ محمدؐ যদিও তোমরা কারামাত-এর নাম ও নিশানা কোথাও দেখতে না পাও, তথাপি,	کرامت گرچہ بے نام ونشان است তোমরা আস এবং মুহাম্মদের (সা.) গোলামদের মধ্যেই তা দেখে নাও।

❁❁❁

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক e`i কাদিয়ান Weekly **BADAR** *Qadian*
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. 5 Thursday 13 - August 2020 Issue. 33

MANAGER :
NAWAB AHMAD
Mobile : +91-94170-20616
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

”صَلَاةٌ فِیْ مَسْجِدِیْ هٰذَا

خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ“

(صحیح بخاری، کتاب فضل الصّلوٰۃ فی مکۃ والمدینۃ)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাজিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,

“আমার এই মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) এক ওয়াক্তের নামায মসজিদে হারাম ব্যতিরেকে অন্য মসজিদের হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম।”

(সহী বুখারী, কিতাবু ফযলুস সলাতি ফি মাক্কাতি ওয়াল মাদীনাতি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে। প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান